গীতার বাণী

শ্রীঅনিলবরণ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

সংশোধন : পৃষ্ঠা ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩-র পেজ-হেডিং 'বেদ ও গীতা' স্থলে 'উপনিষদ ও গীতা' হইবে।

ভূমিকা

জগতের পক্ষে আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে এমন একটা দর্শনশাস্ত্র যাহাকে মানুষ তাহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ন্যায় উৎসাহের সহিত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে। মানুষ বুদ্ধিজীবী, সে যেমন চিন্তা করে তাহার জীবনও ঠিক সেইভাবে গড়িয়া উঠে, এইজন্যই মানব-জাতি, মানব-সমাজের উপর দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব এত অধিক। যে ফরাসীবিপ্লব ইউরোপের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জগতের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহার মূলে ছিল ভল্‌টেয়ার, রুশো প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিকগণের চিন্তা-ধারা। প্রাচীন যুগে ভারতীয় জীবনের মূল সূত্রগুলি আসিয়াছিল বেদ ও উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব হইতে, এবং আজও ভারতবাসীর জীবন মূলতঃ সেই তত্ত্বের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যজগতে আমরা সভ্যতার যে-রূপ দেখিতে পাই, তাহার মূল হইতেছে দার্শনিক জড়বাদ। এই জড়বাদের পরিণতি দেখিয়া লোক আজ ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, অথচ খৃষ্টান ধর্ম্মের যে অধ্যাত্মবাদ তাহাতেও লোকের আর আস্থা নাই। * মানুষ আজ এমন কোন ব্যাপক আদর্শ, সুস্পষ্ট ধর্ম্ম পাইতেছে না যাহাকে ধরিয়া সে নিশ্চিতভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। বর্ত্তমান

---

* "The tree is known by its fruits. The fruits of materialism, of anthropomorphic religion, of the separation of ideals and of means, are under our eyes today and their bitter and unwholsome taste in our mouths. All that we are is the result of what we have thought. We

যুগের মানুষের জীবন আত্মবিরোধ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে একদিকে সুখ ও শান্তি চাহিতেছে, অন্যদিকে এমন আচরণ করিতেছে, যাহাতে সুখ শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। বিজ্ঞান মানব-জীবনকে সমৃদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য ইতি-মধ্যেই যে-সব উপাদান জোগাইয়াছে তাহা চমকপ্রদ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মানবজাতি যদি যথাসঙ্গত-ভাবে নিজেদের ব্যাপার সুব্যবস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে শুধু কয়েকজন মানব বা কয়েকটি শ্রেণীই নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকল নরনারীই সুস্থ সম্পদময় সৌন্দর্য্যময় বিলাসিতার জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এই সুব্যবস্থার কোন সূত্র দিতে পারে নাই; তাহার জন্য চাই মানব হৃদয় ও মনের, মানব প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন এবং তাহা কেবল পরম অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। গীতায় আমরা এইরূপ জ্ঞানের সন্ধান পাই,

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১৪।১

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় আমি বর্ণনা করিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইয়া মুনিগণ এই দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

---

must grasp our ideals consciously and intelligently and pursue them only by means which are themselves compatible with the ideal......It is this combination of intense intellectual effort, intense preoccupation with ultimate truth, and intense emotional and artistic sincerity which is the world's first need today"—Honor Croome commenting on Aldous Huxley's new book,— *Ends and Means.*

যে-বিজ্ঞানের বলে অকূল সমুদ্রের মধ্যে বিপদাপন্ন জাহাজকে সাহায্য করিবার জন্য জাতি-দেশ-নির্বিশেষে বহু জাহাজ বেতারে সংবাদ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতেছে, মানুষ নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিয়া অপরের জীবন রক্ষা করিতেছে এবং এইভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বেরই প্রমাণ দিতেছে, সেই বিজ্ঞানের বলেই আবার মানুষ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়া শত শত নিঃসহায় শিশু নারী রুগ্ন ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে, প্রমাণ করিতেছে যে, মানুষের মধ্যে অসুরটি এখনও মরে নাই। এক এক জন মানুষের রোগ সারাইবার জন্য বিজ্ঞান কত পন্থা আবিষ্কার করিতেছে, আবার ক্ষণকালের মধ্যে বিষবাষ্পের দ্বারা কেমন করিয়া সমৃদ্ধিশালী জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারা যায় তাহারও মারণাস্ত্র জোগাইতেছে। মানুষ এক হাতে যাহা সৃষ্টি করিতেছে অন্য হাতে তাহাই ধ্বংস করিতেছে ; মানবজীবন হইয়া উঠিয়াছে যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন বা পাগলের উদ্দাম নৃত্য ("The present life of the world is a very bad dream and a mad one at that"—Sri Aurobindo)। মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি, মানুষ তাহা ধরিতে পারিতেছে না ; তাই পরস্পরবিরোধী লক্ষ বাসনার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া গভীর গরল পাথারে পতিত হইতেছে। তাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে, এমন এক দর্শন-শাস্ত্র যাহা দ্বারা মানুষ নিজের সত্য সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া উঠিবে, জগৎ কি, মানুষ কি, জগতে মানুষের স্থান কি, মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও গতি কি, এই সব সম্বন্ধে এমন একটা পূর্ণ সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা ক্রমপ্রগতিশীল বিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা পদে পদে ব্যাহত হইবে না, পরন্তু যাহার মধ্যে মানুষের সকল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা

ও অনুভূতির সমন্বয় হইবে, যাহাকে মানুষ সমগ্র হৃদয় মন প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ এই মর-জগতেই মানবজীবনের এক অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য সিদ্ধির দিকে নিঃসংশয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে।

এইরূপ একটা দার্শনিক সমন্বয়ের প্রয়োজন যে কেবল এখনই দেখা দিয়াছে তাহা নহে, যুগে যুগে এইরূপ সমন্বয় অনেক বার হইয়া গিয়াছে এবং সেই সব সমন্বয় মানুষকে তাহার বিকাশের অবস্থা অনুযায়ী পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে। ইউরোপে এইরূপ সমন্বয় হইয়াছে প্রথম গ্রীসের দার্শনিক চিন্তা-ধারায় এবং পরে মধ্য যুগে ক্যাথলিক ধর্ম্মতত্ত্বে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে বাহ্য জগতের পশ্চাতে যে দেব জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাই তৎকালোচিত ভাব ও ভাষায় বেদে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাই হইয়াছে ভারতের সভ্যতার, ভারতীয় জীবন ও সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। উপনিষদ পূর্ব্বতন ঋষিগণের চরম অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে গ্রহণ করিল এবং তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহাকে ভিত্তি করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞানের গভীর ও সমুচ্চ সমন্বয় সাধন করিল। ভারতের এক অতি সমৃদ্ধ অধ্যাত্ম যুগে যে-সকল সত্য দৃষ্ট ও উপলব্ধ হইয়াছিল উপনিষদ সেই সবকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদেব মধ্যে মহান সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। কালক্রমে এই উপনিষদ হইতেই আবার বহু মত, বহু দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, নানা মুনির নানা মতে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল; এই সবের শেষ সমাধান হইয়াছে গীতায়। বর্ত্তমানে আবার যে নূতন দার্শনিক সমন্বয় মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হইতেছে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় এই গীতার মধ্যেই আমরা তাহার সুপ্রশস্ত ভিত্তিটি প্রাপ্ত হই।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে মনোভাব সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, যাহার দ্বারা আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও প্রভাবিত হইতেছেন, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে। পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্ম হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এবং ইহার উপর মানুষ শ্রদ্ধা হারাইয়াছে প্রধানতঃ দুইটি কারণে। প্রথমতঃ ধর্ম্মের নামে পাশ্চাত্য দেশে মানুষের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে ভারতবাসীর নিকট তাহা কল্পনাতীত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-দেশে যখন দশ সহস্র প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীকে ধর্ম্মের নামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তখন তাহাতে রোমের পোপ এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রাণ ক্যাথলিকগণ পরম হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপধর্ম্ম (heresy) দমন করিবার জন্য পোপ যে Inquisition বা যাজকীয় আদালতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা সমগ্র ইউরোপে কত লোককে যে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক স্পেনেই অন্ততঃ ত্রিশ সহস্র ব্যক্তিকে এইভাবে হত্যা করা হয়। তাহাদের অপধর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে অনন্তকাল নরকে দগ্ধ হইতে হইত, তাহাদের মর শরীরকে দগ্ধ করিয়া সেই অনন্ত নরক হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইল, ইহাই ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম্মনেতাদের যুক্তি! খ্রীষ্টানধর্ম্ম সর্ব্বদা ধর্ম্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন গবেষণা জোর করিয়া দমন করিয়াছে। ইটালীর বিখ্যাত দার্শনিক ব্রুণো ইনকুইজিশন্ কর্ত্তৃক সাত বৎসর কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শেষকালে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক সার্ভেটস্‌কে জেনেভায় জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছিল। সূর্য্য জগতের কেন্দ্র, এই কথা বলিবার দুঃসাহসের জন্য গ্যালিলিওকে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চার্চ্চ নির্য্যাতনের যন্ত্র হইয়াছে।

স্পেনের রাজতন্ত্র ও রুশিয়ার জারের দ্বারা প্রজাদের উপর যে অত্যাচার হইত, চার্চ্চ ছিল তাহার সহায়। একশত বৎসর পূর্ব্বেও জার্ম্মানিতে যখন রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো দেওয়া হয়, তখন পাদ্রী-গণ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, কারণ রাত্রিকে দিন করিয়া তুলিলে ভগবানের বিধানের বিরোধিতা করা হয়! আজও খৃষ্টান চার্চ্চের এই প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাব দূর হয় নাই।

একদিকে ধর্ম্মের নামে এই সব অনাচার ও অত্যাচারে আধুনিক মানবের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারসকল খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী জুলিয়ান্ হাক্স্‌লে তাঁহার নব-প্রকাশিত *Religion without Revelation* পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টানদের ব্যক্তিক ভগবানের সহিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সকলের সামঞ্জস্য হয় না এবং ইহাই হইতেছে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মনোভাব। বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বার্গশঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নহেন এবং জগতের উর্দ্ধে কোথাও অবস্থিত নহেন, তিনি এই জগৎ রূপেই অভিব্যক্ত হইতেছেন, সংসারের সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব শুভ অশুভের ভিতর দিয়া, সকল জীব সকল মানুষের ভিতর দিয়া নিজকে ক্রমশঃ চেতনতর, পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছেন।* কিন্তু এইরূপ ভগবানকে লইয়া ধর্ম্ম চলে না, তাই

* "Philosophy leads us not to the conception of a perfect God existing apart from what is very clearly an imperfect universe but of a continuously living and acting God manifested in progressive creation of what we recognise as higher."—*The Philosophical Basis of Biology*—by J. S. Haldane.

লোকে জীবন হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিতে চাহিতেছে। সেই সঙ্গেই পাশ্চাত্যদেশে আর একটি মনোভাব দেখা দিতেছে, তাহা হইতেছে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। জড়বাদ ও নাস্তিকতা জগৎকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিয়াছে দেখিয়া অনেকেই এখন উপলব্ধি করিতেছেন যে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন মানব-জাতির কল্যাণ নাই। কেহ কেহ ভগবানকে বাদ দিয়াই ধর্ম্ম চাহিতেছেন, সে-ধর্ম্মে ভগবানের পরিবর্ত্তে মানুষই হইবে মানুষের উপাস্য দেবতা, এবং এই মতবাদই হিউম্যানিজম্ (Humanism) নামে কথিত। পাশ্চাত্য দেশে অনেকে আজকাল এই একই কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। নৈতিকতার দিক দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম খুবই উচ্চ ও উদার, অথচ উহাতে ভগবান সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা না থাকায় আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহার বিরোধের কোন সম্ভা-বনা নাই।

কিন্তু ব্যক্তিক ভগবান, Personal God এর জন্য মানুষের হৃদয়ে গভীরতম আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এবং ভগবানকে বাদ দিয়া যে ধর্ম্ম হইবে তাহা বেশী লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। বুদ্ধও ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। ভগবান অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, মানুষ মন বুদ্ধির যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারে না, অতএব মানুষ যাহাতে ভগবানকে লইয়া বৃথা তর্ক না করে, সেই জন্যই বুদ্ধ ভগবান সম্বন্ধে নীরব ছিলেন ; যে সাধনার দ্বারা মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারে সেই সাধনার উপরই জোর দিয়াছিলেন। বৌদ্ধরাও শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধকেই ভগবানের ন্যায় উপাসনা করিয়া মানব হৃদয়ের চিরন্তন ক্ষুধা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। রুশিয়ার কম্যুনিষ্টরা ধর্ম্মকে নামতঃ বর্জ্জন করিয়াছে কিন্তু তাহারা ভগবানের পরিবর্ত্তে যে-ভাবে লেনিনের পূজা প্রবর্ত্তন

করিয়াছে তাহা সেই প্রাচীন ধর্ম্মবৃত্তিরই রূপান্তর মাত্র। গীতা মানুষের এই চিরন্তন হৃদয় বৃত্তির হিসাব লইয়াই পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে উপাস্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। গীতাও স্বীকার করিয়াছে যে, ভগবান তাঁহার শ্রেষ্ঠ সত্তায় অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য, ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ। কিন্তু তিনিই আবার এমন রূপ ধরিয়া আসেন যাহাতে মানুষ তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে, তাঁহার সহিত সকল প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহারই ভাব, তাঁহারই প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ'। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে দেখিতেছেন, ভগবান এই জগতের মধ্যেই অনুস্যূত, জগতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও বিকাশ হইতেছে, * গীতা ইহাও স্বীকার করিয়াছে,

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ১৩।২১

পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিজকে এক করিয়া দিতেছেন, প্রকৃতির কর্ম্মে কর্ম্ম করিতেছেন, প্রকৃতির বিকাশে বিকশিত হইতেছেন, মানুষের সকল সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব মিলনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু গীতার মতে ইহা কেবল পুরুষের বা ভগবানের একটি ভাব (aspect), ক্ষরভাব। আর একভাবে পুরুষ প্রকৃতির লীলা হইতে মুক্ত, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা—প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই, তিনি কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর পুরুষ। আর এই

* "God thus defined has nothing of the ready made ; He is unceasing life, action, freedom. Creation so conceived, is not a mystery ; we experience it in ourselves when we act freely, when we consciously choose our actions and plot our lives"—(Creative Evolution by Henri Bergson.)

দুই ভাব ক্ষর ও অক্ষব, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, পরিণামী ও অপরিণামী একই সঙ্গে যাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে তিনিই পুরুষোত্তম। তাঁহারই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া এই জগৎ প্রপঞ্চকে ধরিয়া রহিয়াছে, বিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু এই বিশাল জগৎ তাঁহার শক্তির কণামাত্র, তিনি এ-সবের বহু উর্দ্ধে, এই জগৎকে তিনি তাঁহার একটিমাত্র ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছেন,

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ১০।৪২

অতএব আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞান, দর্শন বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন ভাবে ভগবানকে যে-রূপ পরিকল্পনা করিয়াছে,—ব্যক্তিক ঈশ্বর, বিশ্বগত নির্ব্যক্তিক সত্তা, বিশ্বাতীত পরম অনির্ব্বচনীয় সত্তা, এ-সবেরই অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে; ভগবানকে এইরূপে সমগ্রভাবে জানিয়া এবং তাঁহার নিকটে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াই মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশ করিতে পারে, মানবজীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে।

ইউরোপের ন্যায় ভারতে কখনও ধর্ম্মের নামে অমন নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই, আর ভারতে ধর্ম্ম কখনও দর্শন, বিজ্ঞান বা স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী হয় নাই। ভারতে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকেও উচ্চতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতের আবহাওয়াতেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, তাহাদের প্রয়োজনও ভিন্ন, যে যে-ভাবে ভগবানকে উপাসনা করিতে চায়, করিতে পারে, তাহাকে সেই ভাবেই উপাসনা করিবার সুযোগ দিতে হইবে। যদি কেহ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এই ঐহিক জীবনের সুখ ভোগকেই পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় তাহাকেও সেই সুযোগ দিতে হইবে; ভারতে চার্ব্বাক দর্শনে এইরূপ মতই প্রচারিত হইয়াছিল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৪।১১

"হে পার্থ, যে যে-ভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই-ভাবেই ভজনা করি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যত মত, তত পথ," বস্তুতঃ গীতার মতে "যত মানুষ, তত পথ।" গীতার এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।"

দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতে এই সবই হইতেছে ধর্ম্মের অন্তর্গত, ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত, ভারতবাসীর সমস্ত জীবনই হইতেছে ধর্ম্ম বা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানা শাখা ও সম্প্রদায় আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে তিনটি অঙ্গ। প্রথম, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ বহির্মুখী. এই সকল আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ তাহারা অন্তর্মুখী হইয়া উঠে। বাহিরে যাহা হোমের অগ্নি তাহাই হৃদয়ে ভগবদ্ আকাঙ্ক্ষা-রূপ ঊর্দ্ধমুখী জ্বলন্ত শিখার প্রতীক ; দেবতার উদ্দেশে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে করিতে মানুষ সমগ্র জীবনকেই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিবার শিক্ষা লাভ করে। এই সব আচার অনুষ্ঠান অনেক সময়ে অর্থহীন অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে ; কিন্তু শুধু মন বুদ্ধি যুক্তি তর্ক লইয়াই মনুষ্যত্ব নহে ; মানুষের আছে দেহ, প্রাণ, হৃদয়—এই সকলের উপরে অধ্যাত্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ ইহাদিগকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। মানবজীবন বিকাশের এই সমগ্র প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই হিন্দু ধর্ম্মের নানা আচার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। এই সকল আচার

অনুষ্ঠানের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে শুচিতা, সৌন্দর্য্য এবং প্রতীকতা। সৌন্দর্য্য উপাসনার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া চির-সুন্দর ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, ভারতের সাহিত্য, ভারতের মঠ ও মন্দির, ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার ও অনুষ্ঠান তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ এই ধর্ম্মের আছে দার্শনিক ভিত্তি। ঈশ্বর কি, জীব কি, জগৎ কি, ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ কি, জীবের শ্রেষ্ঠ গতি কি, মানবজীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি ও সার্থকতা কিসে, এইসব সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উপর হিন্দুস্থানের সকল ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যুক্তি ও গবেষণার ফলে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, হিন্দুর দর্শনের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Evolution বা ক্রমবিবর্ত্তনবাদের কথা বলা যাইতে পারে। জড় প্রকৃতি হইতেই কেমন করিয়া ক্রমশঃ প্রাণী জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, এই সকল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতির মূলে আঘাত পড়িয়াছে। কিন্তু যে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ আধুনিক বিজ্ঞান অতি অস্পষ্টভাবে ধরিবার বুঝিবার প্রয়াস করিতেছে, উপনিষদের ঋষিগণ বহু পূর্ব্বেই তাহার সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক পূর্ণাবয়ব ধর্ম্মের এক নিগূঢ় অংশ আছে, অধ্যাত্ম বা যোগসাধনা। আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, দার্শনিক চিন্তা বিচারের ভিতর দিয়া যাহাদের প্রাণ, মন, হৃদয়ের যথেষ্ট পুষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে, অধ্যাত্ম জীবন লাভের যোগ্যতা যাহারা লাভ করিয়াছে, তাহাদের জন্যই এই নিগূঢ় সাধনা। এই সাধনার দ্বারা চেতনার রূপান্তর সাধিত হয়, মানুষ মানব-চৈতন্য হইতে উঠিয়া ভাগবত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় হিন্দু দর্শন কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই জীব, জগৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করে নাই। যাহাতে মানব এই সকল

তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া সাধনার দ্বারা কার্য্যতঃ নিজের জীবনের রূপান্তর সাধন করিতে পারে, মুক্তি বা দিব্য অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে পারে, হিন্দুধর্ম্মে সে সম্বন্ধে নিগূঢ় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই ধর্ম্মের ভিত্তি অতিশয় সুদৃঢ়। আপাত-দৃষ্টিতে হিন্দু-ধর্ম্মের যে-অংশকে অযৌক্তিক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে তাহারও সার্থকতা ও উপযোগিতা বুঝিতে পাবা যায়। এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসর কত গুরু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজও সঞ্জীবিত রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সকল সন্দেহ ও সংশয়কে জয় করিয়া মানব সমাজ, মানব জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মেও মাঝে মাঝে গ্লানি আসিয়া জুটিয়াছে, ধর্ম্মের মূল সত্যকে হারাইয়া মানুষ বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে, বলিয়াছে, "ইহাই সব, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই," নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ। কিন্তু যুগে যুগে যখন এইরূপ ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তখন সেই গ্লানি দূর করিয়া মানুষকে সত্য ধর্ম্মের পথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধু, সন্ত, মহাজনের অভাব এই পুণ্য ভারতভূমিতে কখনই হয় নাই। অবশ্য ভারতের সকল লোকই যে ধার্ম্মিক বা আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছে এ কথা বলা যায় না। সকল দেশেরই অধিকাংশ মানুষ হইতেছে বহির্মুখী, ঐহিকতাপরায়ণ, এবং ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বহুকালব্যাপী আধ্যাত্মিকতামূলক সভ্যতার প্রভাবে ভারতে এমন পরিবেষ্টন গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারত-বাসীর হৃদয় মন এমন ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে যে, ভারতবাসীর মনকে যত সহজে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট করা যায়, ভারতে অধ্যাত্ম সাধনা যত সহজে সুফল প্রসব করে এমনটি আর জগতে

কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কঠিন দার্শনিক তত্ত্বগুলি ভারতের নিম্নতম শ্রেণীর লোকও যে-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অন্য কোন দেশের লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব হইত না। বেদান্তের মহতী শিক্ষা ভারতবাসী আপামর জনসাধাবণের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অতএব জগৎ যে আজ এক নূতন আধ্যাত্মিক সমন্বয়, আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানেব প্রয়োজন একান্ত ভাবে অনুভব কবিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই তাহাতে নেতৃত্ব করিবে এইরূপ আশা কবা কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মূল উৎস গ্রীক্ দর্শন যে ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের স্থান নাই। সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শুধু দার্শনিক চিন্তাবই নহে পবন্তু আধুনিক নবতম বিজ্ঞানের মূল ধারাগুলির উৎস সন্ধান কবিলে প্লেটোর (Plato) মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রীসদেশে কিম্বদন্তী আছে যে, অন্যান্য গ্রীক্ দার্শনিকের ন্যায় প্লেটোও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটোর দার্শনিক গ্রন্থের ভাষার সহিত কোন কোন স্থানে উপনিষদের ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়া মোক্ষমূলর অনুমান করিয়াছেন যে, প্লেটো ভারতীয় দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উপনিষদে জীবকে রথী এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (কঠোপনিষৎ— ১।৩।৩-৪)। প্লেটো তাঁহার Phaedrus নামক গ্রন্থে হুবহু এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। অধ্যাপক আরুইক (E.T.Urwick) প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত রিপাব্লিক্ (Republic) গ্রন্থে যে মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন তাহা ভারতীয়

মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অধ্যাপক উইন্‌টারনিজ্ তাঁহার বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থে বলিয়াছেন, "গার্ব্বে অনুমান করেন, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, Democritos এবং Epicurus-এর দার্শনিক মতবাদ ভারতীয় সাংখ্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। পীথাগোরাস যে সাংখ্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর Gnostic ও Neo-Platonic দর্শন যে ভারতীয় দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত।" প্রাচীন পারসিক জাতির সহিত গ্রীসের বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় চিন্তারাজ্যেও আদান প্রদান চলিত। ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তাস্রোত যে পারসিকগণের মধ্য দিয়া গ্রীসে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

পাশ্চাত্য দেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ আধুনিক মনীষী হইতেছেন নীট্‌শে এবং বার্গশঁ। নীট্‌সের মূল মত অতিমানববাদ, মানুষকে তাহার মানবত্ব ছাড়াইয়া এক নূতন উচ্চতর জীবন লাভ করিতে হইবে; আর নীট্‌শে বলিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি অসাধারণ মানবগণ তাঁহার অতিমানবের আদর্শ নহেন, মানুষ যেমন বানর অপেক্ষা বড়, অতিমানব তেমনি হইবে মানুষ অপেক্ষা বড়, একটা নূতন জাতি, Species *। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মূলতঃ এই শিক্ষাই দিয়া-

* "Naked have I seen both of them, the greatest man and the smallest man; all-too-similar are they still to each other. Verily even the greatest found I—all-too-human. Man is something to be surpassed—what have ye done to surpass man? All beings have created something beyond themselves, and ye want to be the ebb of that great tide and would rather go back to the beast than surpass man? Let

ছিলেন। বর্ত্তমান মানুষের যে দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধির জীবন, ইহা হইতেছে সত্ত্বাদি তিনগুণের খেলা, অজ্ঞানের জীবন, এই গুণত্রয়ের উপরে উঠিয়া এক মহত্তর ভগবৎ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"। কিন্তু এই অতিমানবত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং কেমন করিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে, নীট্‌শের দৃষ্টি তাহার সন্ধান পায় নাই। সাধারণ পাশ্চাত্য ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নীট্‌শে মনে করিয়াছেন যে, সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিয়া শুধু শক্তির অনুশীলন করিলেই মানুষ অতি-মানবত্ব লাভ করিবে এবং এই জন্যই নীট্‌শে খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা দয়া, স্নেহ প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে দমন করিলে মানুষ অসুরে পরিণত হয়, অতিমানবত্ব লাভ করিতে পারে না *। গীতা বলিয়াছে মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর আছে সে-সবের উচ্চতম বিকাশ করিয়াই মানুষ অতি-মানবত্ব লাভ করিবে, গীতার অতিমানব অসুর নহে, দেবতা—সে হইবে ভগবানের সহিত সমধর্ম্মী, মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, মদ্ভাবমাগতাঃ ; এবং ইহার উপায় শুধু শক্তির অনুশীলন নহে, ইহার উপায় হইতেছে কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি মানুষের সকল দিব্য প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া মানবজীবনের সকল সম্ভাবনার পূর্ণতম বিকাশ করা। আমরা সর্ব্বদা যাহাকে ভাবনা করি, যাহাকে আমাদের সমস্ত হৃদয় মন দিয়া

your will say: The superman shall be the meaning of the earth. Upward goes our way from species to superspecies."
—*Thus spake Zarathustra*—by Nietzsche.

* নীটশের দার্শনিক চিন্তার প্রভাব জার্ম্মান জাতির আসুরিক বলের অনুশীলনে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান এবং বর্ত্তমান জগতে ইহা অন্যান্য জাতিকেও প্রভাবিত করিতেছে।

ভালবাসি আমরা তাহার ভাব লাভ করি, বস্তুতঃ তাহাই হইয়া উঠি। ভগবানের ভাব, ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিবার উপায় হইতেছে সর্ব্বদা তাঁহারই ভাবনা করা, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ, এবং ইহার অর্থ হইতেছে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে আমাদের সকল কর্ম্ম করা, সমগ্র জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে যেমন বিশ্বের অতীতে তেমনিই বিশ্বের প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুস্যূত দেখা এবং সর্ব্বত্র তাঁহাকেই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভালবাসা নিবেদন করা,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

ইহাই হইতেছে গীতোক্ত সাধনার সারতত্ত্ব।

ভগবানের সাধর্ম্ম্যলাভ বলিতে কি বুঝায় গীতা কোথাও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই, উত্তমম্ রহস্যম্ রূপেই ইহাকে রাখিয়া দিয়াছে; গীতা যে সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়াই সাধকগণ আপন আপন জীবনে এই রহস্যকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবেন। অতিমানববাদের ব্যাখ্যা করা গীতার উদ্দেশ্য ছিল না, সেই যুগে সন্ন্যাসের দিকে, জীবন ও কর্ম্ম ত্যাগের দিকে যে প্রবৃত্তি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার প্রাচীন সামঞ্জস্য নষ্ট করিতেছিল সেইটির প্রতিরোধ করাই ছিল গীতার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনের সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-ত্যাগের প্রবৃত্তিকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াই গীতার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং এইটিকে মূল সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়াই গীতার সমগ্র শিক্ষা কথিত হইয়াছে। গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে যে, ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই সংসারে কর্ম্ম করিয়াই মানুষ উচ্চতম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, ইহার জন্য সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাসের কোনই আবশ্যকতা নাই,

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

নিশ্চল শান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সক্রিয়তা, ইহাই গীতার প্রস্তাব।

অচল অটল শান্তির ভিত্তিতে বৃহত্তম কর্ম্ম করা, পরম আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নীরবতার মুক্ত অভিব্যক্তিরূপে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করা--ইহাই গীতার মর্ম্ম কথা। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যার সম্মুখে গীতার এই কল্যাণময় শিক্ষা দাঁড়াইতে পারে নাই, পরে আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক তীব্রভাবে মায়াবাদ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচারের ফলে এই শিক্ষা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গীতার শিক্ষা অনুসারে জীবনকে গঠন করিয়া অতি-মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইবার যুগ তখনও আইসে নাই। গীতার যে সাধর্ম্ম্যের আদর্শ, ভগবানের ভাব ও প্রকৃতি লাভের আদর্শ, ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে যীশুখ্রীষ্টের রহস্যময় উক্তিতে, "Be perfect as your Father in heaven is perfect ;" নীট্‌শে, বার্গশঁ, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি আধুনিক মনীষীগণের শিক্ষায় আমরা এই আদ-র্শেরই ক্ষীণ আভাস দেখিতে পাই। কিন্তু গীতার শিক্ষার পূর্ণতম মর্ম্মটি বিকশিত হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের যোগে ; মানুষ কেমন করিয়া ভগবা-নের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অতিমানস চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই হইতেছে সেই যোগের মূল কথা।

আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষী হইতেছেন বার্গশঁ। তাঁহার প্রধান কথা এই যে,* এ জগতে কিছুই স্থির নহে, এ জগৎ এক মহান প্রাণ-শক্তির (*Elan vital*) খেলা, অনবরত এখানে পরিবর্ত্তন,

* 'This persistently creative life, of which every individual and every species is an experiment, is what we mean by God ; God and life are one But this God is finite, not omnipotent, limited by matter, and overcoming its inertia painfully step by step ; and not omniscient, but groping gradually towards knowledge and consciousness and light "—*Durant on Bergson's Conception of God.*

বিকাশ ও সৃষ্টি চলিতেছে, এবং এই সব বিকাশের ভিতর দিয়া জগৎ এক অভূতপূর্ব আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই প্রাণশক্তি একদিন মর্ত্তালোকে মৃত্যুকেও জয় করিবে, এমন স্বপ্নও বার্গশঁ দেখিয়াছেন। ভগবান এই প্রাণশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন, সৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি ক্রমশঃ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। এই মত এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ডারউইনের ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ খ্রীষ্টানধর্ম্মের ভিত্তিটি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ হইতেছে গীতার উদার শিক্ষার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। ভগবান জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, জীবের অন্তর্নিহিত যে ভাগবত সত্তা তাহাই এই ক্রম-বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এই জীবই প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি বিকাশ করিতেছে। কিন্তু এই জীব হইতেছে ভগবানের অংশ মাত্র,

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৫।৭

ভাগবত চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব অজ্ঞান ও অপূর্ণতার মধ্যে নামিয়াছে এবং ক্রমশঃ সেখান হইতে আবার ভাগবত চৈতন্যের পূর্ণতা ও অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতেছে—ইহাই পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের মূল রহস্য। ভগবানের মধ্যে কখনও কোনরূপ অপূর্ণতা নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, আপনার আনন্দে আপনি চিরপূর্ণ।

এই জগতে যে অনবরত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, “জগৎ” শব্দটির দ্বারাই তাহা সূচিত হইতেছে এবং গীতায় ইহা অতি স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

"মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ কর্ম্ম না করিয়া দণ্ডায়মান নাই, প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা বাধ্য হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়।" সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের দ্বারাই প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করিতেছে, আর এই তিন গুণ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে (গীতা ১৪।১০)। কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে ভগবান এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এই খৃষ্টান মতবাদ গীতার নহে। গীতার মতে ভগবান তাঁহার প্রকৃতি দ্বারা অনবরত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, এই ভাবেতে ধ্বংসের সহিত সৃষ্টি সমতালে চলিয়াছে এবং এই ভাবেই জগতের ভিতর ভগবান নিজকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ভাবে প্রকট করিয়া তুলিতেছেন,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

কিন্তু এই অবিশ্রান্ত সৃষ্টি, কর্ম্ম, বিবর্ত্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে শান্ত, অচল, অক্ষর, কূটস্থ সত্তা, তাহার মধ্যে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তাহারই জন্য জগতের সকল কর্ম্ম, সকল গতি সম্ভব হইয়াছে,

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ১৩।২৯

বার্গশঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রকৃতির অবিশ্রান্ত কর্ম্মধারাই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ভিত্তি-স্বরূপ যে অচল, অক্ষর, অকর্ত্তা আত্মা রহিয়াছে তাহার সন্ধান তাঁহারা পান নাই। পাশ্চাত্য জীবনের উপর এই মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য জাতি কর্ম্মের জন্য পাগল, অস্থিরভাবে তাহারা কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে, কর্ম্মের মধ্যেই তাহারা জীবনের পূর্ণতা দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের এই কর্ম্মের পশ্চাতে কোন সুদৃঢ় অধ্যাত্ম ভিত্তি নাই, তাই সে-কর্ম্ম আত্ম-বিরোধে পরিপূর্ণ, তাহা দুঃখ, অশান্তি ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতেছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে হইয়াছে রজোগুণের প্রাধান্য, এবং এই গুণের ফলই

হইতেছে দুঃখ ও অশান্তি, রজসস্তু ফলং দুঃখম্। ভারতও তাহার গৌরবময় যুগে বহুল কর্ম্ম ও সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু সেখানে ছিল সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্য। ভারত যেমন উচ্চতম দার্শনিক জ্ঞানকে জীবনের ভিত্তি করিয়াছে, জ্ঞানী, ঋষি, দার্শনিককে সমাজের নেতা করিয়াছে, এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এবং ইহাই হইতেছে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সত্ত্বগুণও স্থির থাকিতে পারে না, মানুষের জীবন আধ্যাত্মিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাহার মধ্যে সত্ত্বও তমো-গুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, ভারতে তাহাই ঘটিয়াছে। রাজসি-কতার প্রাধান্যের জন্য পাশ্চাত্য জগৎ অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আর তামসিকতার প্রভাবে ভারতকে যেন মৃত্যুর শান্তি চাপিয়া ধরিয়াছে। এই দুইটিকেই অতিক্রম করিতে হইবে, তমোগুণের মৃত্যুতুল্য শান্তি নহে, আত্মার মধ্যে যে অনন্ত অবিচল শান্তি ও নীরবতা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং তাহারই প্রকাশস্বরূপ প্রকৃতিতে পূর্ণতমভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রকৃতির এই তিন গুণকে রূপান্তরিত করিয়া জ্যোতি, তপঃশক্তি ও অধ্যাত্ম শান্তিতে পরিণত করিতে হইবে, তবেই এই দুঃখদ্বন্দ্বময় মানবজীবন দিব্যজীবনে পরিণত হইবে, এবং ইহাই হইতেছে গীতার শিক্ষার উত্তম রহস্য।

আমরা এমন কথা বলি না যে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে, মানব সম্বন্ধে, মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, সে-সব নিঃশেষে গীতায় কথিত হইয়াছে। ইহা হইতে পারে না ; সত্য এক হইলেও বহুমুখী, তাহার আছে অনন্ত ভাব, অনন্ত ব্যঞ্জনা, সে-সবই এক অবতারের দ্বারা, একই গ্রন্থে কথিত বা সঙ্কলিত হইবে তাহা সম্ভব নহে। মানুষকে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে আরও অনেক কিছু জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, গভীর অনুসন্ধিৎসার দ্বারা নূতন নূতন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে এবং সেই-সব সত্যকে সাধনার

দ্বারা নিজেদের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষের দার্শনিক চিন্তাধারা আজ পর্যান্ত গীতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, সে-চিন্তার মধ্যে যাহা কিছু সার ও মহৎ আছে গীতার শ্লোকগুলিতে সে-সবেরই গভীর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। সম্মুখ দিকে আরও অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে গীতার এই সমন্বয়-কেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমরা কোন্ দিকে কি ভাবে অগ্রসর হইতে পারি গীতার মধ্য হইতেই তাহার সমুজ্জ্বল নির্দ্দেশ লাভ করিতে পারিব।

গীতার বাণী

বেদ ও গীতা

বেদের সহিত গীতার সম্বন্ধ বিচার করিতে গেলে প্রথমেই দেখা যায়—গীতা যেন বেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত গীতা বেদবাদিগণের প্রতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছে; এবং ৪৫ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

—"ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলাই বেদের আলোচ্য বিষয়; অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।" আর এক স্থানে গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তি বেদ ও উপনিষদকে অতিক্রম করেন,—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।

গীতার ন্যায় উদার, সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল, আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষার উৎস বেদকে নিন্দা করিতেছে, অবহেলা করিতেছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক আমরা যদি ভাল করিয়া দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, গীতা বেদকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে; এবং কার্য্যতঃ গীতার যে শিক্ষা, তাহার মূল তত্ত্বগুলি অধিকাংশই উপনিষদ হইতে এবং উপনিষদের মূল বেদ হইতে গৃহীত। গীতা নিজেই বেদের মহত্ত্ব পরে স্বীকার করিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৫ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্‌।

"সকল বেদে আমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়.—আমিই বেদান্তের প্রণয়নকর্ত্তা, আমিই বেদের জ্ঞাতা।" গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতার সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া গীতার প্রত্যেক অংশের অর্থ করিতে হইবে। কোন একটি শ্লোক দেখিবামাত্র গীতার অর্থ সম্বন্ধে যদি আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে ভুল করিব। একস্থানে গীতা বেদকে নিন্দা করিতেছে বলিয়া মনে হয়; এবং আর একস্থানে গীতা বেদকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, বেদের বিকৃত অর্থ করিয়া, বেদের মর্ম্ম প্রকৃতভাবে না বুঝিয়া, যাহারা বেদের দোহাই দেয় এবং বেদের নামে লোকের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে —গীতা কেবল সেই বেদবাদরতাঃ ব্যক্তিগণকেই নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু গীতা নিজে বেদের শিক্ষার নিগূঢ় মর্ম্মের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইয়াছে। অতএব গীতা বেদের বিরোধী নহে, বরং গীতাকেই বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতং"—এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহ-স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার বক্তৃতায় একস্থানে বলিয়াছেন—"The only commentary, the authoritative commentary on the Vedas, has been made once and for all by him who inspired the Vedas, by Krishna in the Gita"—"বেদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হইতেছে গীতা। যিনি বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে বেদের আলোক জ্বালিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতাতে বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই বেদের শেষ ও চরম ব্যাখ্যা।"

বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন, তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কথাটা একটু

বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। বেদের এক একটা ঋক্, এক একটা মন্ত্র বা কথা লইয়া কত বাদানুবাদ করা যায়, কত রকমের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করা যায়—সে সব চেষ্টা না করিয়া কেবল গীতা পড়িলেই বেদের মর্ম্ম বুঝা যাইবে এ কেমন কথা? বাস্তবিক, বেদের আলোচনা করিয়া যাঁহারা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য স্বামীজী নিশ্চয়ই এ-কথা বলেন নাই। আর যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, আর যত পরিশ্রমই করুন না কেন—বৈদিক যুগে ঋষিগণ কখন কি অর্থে কি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোথায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, লক্ষ্য কি ছিল—সহস্র সহস্র বৎসর পরে এতদিনে সে-সব সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব—বেদ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈদিক যুগ হইতে আমরা এত দূরে সরিয়া আসিয়াছি, আমাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাব সেই যুগের মানুষ অপেক্ষা এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, বেদের আদিম অর্থ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করিবার আশা দুরাশা মাত্র। আমরা নিজেদের মনের মত করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিব, ফলে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িব। বর্ত্তমানে বেদের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বেশ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তাহা হইলে কি বেদ পড়িয়া কোন লাভ নাই? বেদ হইতে কি আমরা কোন সাহায্য পাইতে পারি না? সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মূল স্বরূপ বুঝিতে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে, ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিতে, বেদ হইতে কি আমরা কোন আলোকই পাইতে পারি না? হাঁ, পারি—বেদ পড়িয়া লাভ আছে—কিন্তু পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য বেদ পড়িয়া কেবল মস্তিষ্কের চালনা ভিন্ন অন্য কোন লাভই নাই। বৈদিক ঋষিদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গিটা কি ছিল, মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কি সব গুহ্য কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন এবং মানব-জীবনকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবার

জন্য কি উপদেশ, কি সঙ্কেত তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন—মোটামুটি এই সব জানিবার জন্য বেদ পড়িয়া লাভ আছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধি বিচারের দ্বারা এই নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা সম্ভব নহে। যাঁহারা সাধনার বলে বৈদিক ঋষিগণের ন্যায়ই কতকটা অন্তর্দ্দৃষ্টি পাইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম জানা সম্ভব। গীতায় আমরা তাহাই দেখিতে পাই। গীতা বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবার কোন চেষ্টা করে নাই,—গীতাকার দিব্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বেদ-নিহিত সনাতন সত্য-গুলি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে আধ্যাত্মিক জীবনের এক নূতন শাস্ত্র, নূতন বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব গীতাকে বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না।

গীতা বেদের সত্যগুলিকে লইয়া কিরূপ নূতনভাবে প্রকাশ করিয়াছে গীতার বিশ্বরূপের বর্ণনা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। এই বর্ণনার মূল হইতেছে ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্ত। ঐ সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি এই—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

"বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ; তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, দশদিক অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন।"

গীতা যে বলিয়াছে, জীব ভগবানের অংশ, মমৈবাংশঃ, তাহারও মূল রহিয়াছে এই সূক্তে, পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি, এই অনন্তমস্তক পুরুষের এক পাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব ও ভূতগ্রাম। বেদে ও গীতায় এই যে অনন্ত-মস্তক পুরুষের বর্ণনা, ইহা হইতেছে একটি শক্তিশালী রূপক, দিব্য কবিত্বের ভিতর দিয়া বচন-মনের অতীত পূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ। বেদের ভাষা সাধারণতঃ এইরূপ রূপক

হইলেও, গীতার পদ্ধতি বিভিন্ন; বেদে যাহা রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে গীতা সোজা ভাষায় তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছে। বেদে চারি বর্ণের তত্ত্ব এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

বেদের এই ঋক্‌টীর অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, সৃষ্টিকালে বিধাতার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ—ইহার অর্থ নহে যে, "ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জন্মিলেন"। বস্তুতঃ বেদের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই ঋক্‌টি রূপকাত্মক, এখানে একটি উপমার ভিতর দিয়া একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রকটিত হইয়াছে। বৈদিক রচনায় উপমা বা রূপক গভীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, শুধু ভাব প্রকাশের একটি কৌশল মাত্র হইলেই তাহার চলিত না, তাহাকে সত্য প্রকটন করিতে হইত। প্রাচীন যুগের লোকের নিকট কবি ছিলেন দ্রষ্টা, এই সকল দ্রষ্টাদের নিকট রূপক ছিল অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করিবার উপযোগী প্রতীক। তাঁহাদের নিকট সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষের শরীরের এই প্রতীক কেবল মাত্র একটি উপমাই ছিল না, ইহা একটি দিব্য সত্যকে প্রকট করিয়াছিল। তাঁহাদের নিকট মানব-সমাজ ছিল জীবনের মধ্যে বিশ্বপুরুষকে প্রকট করিবার প্রয়াস। চারিবর্ণের প্রতীক তত্ত্ব হইতেছে এই—ইহারা মানুষের মধ্যে ভগবানকে জ্ঞানরূপে, ভগবানকে শক্তিরূপে, ভগবানকে উৎপাদন, ভোগ ও আদান-প্রদানরূপে, ভগবানকে সেবা, আনুগত্য ও কর্ম্মরূপে প্রকট করিতেছে, এবং এই চারিবর্ণের অনুরূপ চারিটি বিশ্বনীতিও রহিয়াছে—প্রজ্ঞা (Wisdom) বস্তু-সকলের শৃঙ্খলা ও মূলনীতি উদ্ভাবন করিতেছে, শক্তি (Power) তাহাকে অনুমোদন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে প্রবর্ত্তন করিতেছে, সুসঙ্গতি (Harmony)

তাহার অংশ-সকলের সুব্যবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্ম (Work) অন্য সকলের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত কবিতেছে। তার পর এই পরিকল্পনা হইতে বিকশিত হইল এক সুদৃঢ় অথচ তখনও নমনীয় সামাজিক ব্যবস্থা, তাহার ভিত্তি ছিল মুখ্যতঃ গুণ (ethical type) ও তাহার উপযোগী নৈতিক শিক্ষা ও অনুশাসন এবং গৌণতঃ কর্ম্ম, যাহা গুণেব অনুযায়ী হইবে, নৈতিক বিকাশের সহায় হইবে এইরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্ম্ম। এই তত্ত্বটিই গীতা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে,

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

বেদাদি শাস্ত্রেব ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ, তাহাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। পথের সন্ধান দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন আমবা অতিমাত্রায় শাস্ত্রের অধীন হইয়া পড়ি, তখন আমাদেব ভিতরে সকল শাস্ত্রেব কর্ত্তা, সকল শাস্ত্রেব বেত্তা স্বয়ং ভগবান যে বহিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিয়া কেবল শাস্ত্র-বিচাবে মগ্ন হই। সকল শাস্ত্রেব উদ্দেশ্য এই অন্তরস্থিত ভগবানকে জানা, তাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না। শাস্ত্র যখন বিচার-বিতর্কেব জালে সেই ভগবানকেই ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এইজন্যই গীতা সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে—"সমস্ত দেশ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেলে সামান্য কূপের জলের যতটুকু প্রয়োজন—অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন নাই, জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত বেদে ততটুকুই প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই নাই।" বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতি শাস্ত্রেব আলোচনায় বুদ্ধি যে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতে পাবে, গীতা "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" কথার দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে। অতএব, বেদাদি শাস্ত্র লইয়া বেশী মাথা না ঘামাইয়া, যাহাতে ভিতরে জ্ঞানের আলো লাভ করিতে পারা যায়—সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। গীতা তাহারই সরল, সহজ পথ দেখাইয়া

দিয়াছে। দিব্য-দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সত্যসকল গ্রহণ করিয়া, সাধন-জীবনের এমন পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যাহার অনুসরণ করিলে ক্রমশঃ সাধকের অন্তর ভিতর হইতেই আলোকিত হইয়া উঠিবে,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা; সে বেদ উপনিষদ অতিক্রম করিবে,—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। অতএব বেদাদি শাস্ত্রকেই পবম বস্তু বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গীতা বেদার্থের সার সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে, বেদে যাহা আছে, গীতাতে তাহার অধিক আব কিছুই নাই। বাস্তবিক সত্য এক ও সনাতন হইলেও দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বিভিন্ন, রূপ বিভিন্ন। যুগ যুগান্তের ভিতব দিয়া সত্যের পূর্ণ প্রকাশের লীলা চলিয়াছে—সত্য অনন্ত, সত্যের প্রকাশও অনন্ত। অতএব, কোনও যুগে, কোনও দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের সমস্ত সত্য নিঃশেষে কথিত হইয়াছে, কিংবা কোন যুগাবতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ছাড়া বলিবার বা ভাবিবাব কিছু নাই—এরূপ ধারণা নিতান্ত অপরিপক্ক ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ফল। অবশ্য বেদের ন্যায় আধ্যাত্মিক সত্যের আকর ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। সনাতন সত্যসমূহ বীজরূপে বেদে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগে তাহাদের যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহাই যে চিরকালের জন্য, তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই, ইহা বলিলে নিতান্তই ভুল হইবে। বেদকে ভিত্তি করিয়া উপনিষদ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; আবার বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া গীতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। গীতা-শিক্ষার মূল বেদ ও উপনিষদে রহিয়াছে; কিন্তু গীতা এমন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে যাহা বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায় না। গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এইরূপ তত্ত্ব। বীজ-রূপে ইহা বেদ ও উপনিষদে নিহিত আছে বটে, কিন্তু গীতাতেই ইহার পূর্ণ

বিকাশ হইয়াছে। আবার বেদে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা, যে বর্ণনা আছে, কালক্রমে তাহাতে গ্লানি প্রবেশ করে। উপনিষদের যুগে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া খুব বিরোধ হয়। গীতাও বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডকে তীব্র নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের খুবই অবনতি হইয়াছিল। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, কালক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠান সমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপের পুনরাবির্ভাব করাইতে চান, তাঁহারা ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যাহাই হোক, গীতা ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির প্রকাশ্য নিন্দা কবিয়াছে (২য় অধ্যায়—৪২-৪৫)। তথাপি গীতা বৌদ্ধগণের ন্যায় যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম সত্যটি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ শব্দকে অতি উদার অর্থ প্রদান করিয়াছে। যজ্ঞ যেমন দেবতাদের উদ্দেশে করা হয়, আমাদের ভিতর ও বাহিরের সকল কর্ম্মই সেইরূপ ভগবানে উৎ-সর্গ করিতে হইবে,

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

গীতা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে এইভাবে সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা বুঝিয়াছে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ ঈশ্বর। কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পিত গৌণ অর্থ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। গীতা যজ্ঞ শব্দে যজ্ঞই বুঝিয়াছে। তবে যজ্ঞমাত্রেরই লক্ষ্য হইতেছেন ভগবান। প্রকৃতির সকল জীব, সকল ক্রিয়াই ভগবানের জন্য, ভগবান হইতে আসিতেছে, ভগবানের দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে, ভগবানের অভি-

মুখে চলিয়াছে। অতএব এই সমুদয়কে যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করিলে আমাদের জীবনের যাহা নিগূঢ় সত্য তাহারই অনুসরণ করা হয়। অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমরা এই সত্য হারাইয়া ফেলি, স্বার্থ-ভাবের বশে কর্ম্ম করি, তাই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। প্রাচীন টীকা-কারগণ যে এখানে "যজ্ঞ" শব্দের "ঈশ্বর" অর্থ করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মতেও যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে কেবল বৈদিক যজ্ঞ এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মগুলিই বুঝায় না; যে কর্ম্মই হোক না, তাহা যদি ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না।

বেদ বলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের শাস্ত্রই বুঝায়; অন্ততঃ বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকর্ত্তা সায়ণাচার্য্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, কেমন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনু-ষ্ঠান করিয়া দেবতাগণকে তৃপ্ত করিতে হয়, এবং এইরূপে তৃপ্ত দেবগণের নিকট হইতে নানা কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়—বেদে তাহারই বর্ণনা আছে। বেদ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাকেই গীতা বেদবাদ নাম দিয়াছে। ইহার বিপরীত যে ধারণা তাহাই ব্রহ্মবাদ। বাস্তবিক, যখন গীতা রচিত হয় তাহার পূর্ব্বে বহুদিন ধরিয়াই বেদের অর্থ লইয়া দ্বন্দ্ব ও মতভেদ চলিতেছিল; এবং সে দ্বন্দ্বের দুইটি প্রধান মীমাংসা হইয়াছিল—একটি মীমাংসা পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং অপরটি উত্তর-মীমাংসা। বেদের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড; এবং বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের যে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই বেদের কর্ম্মকাণ্ড। বেদের এই দুই কাণ্ডের মধ্যে বিরোধ বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া যাঁহারা বলিলেন যে, যাগযজ্ঞাদিই প্রধান ব্যাপার, বিধিসঙ্গতভাবে এই ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারি-

লেই ইহলোকে ধন, পুত্র জয়, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায়, এবং পরলোকে স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়, এবং ইহাই বেদের মূল শিক্ষা —তাঁহাদের মীমাংসার নামই পূর্ব্ব-মীমাংসা। আর যাঁহারা বলিলেন যে, এইসব যাগযজ্ঞাদি অতি নীচের ব্যাপার, কেবল প্রথমাবস্থায় ইহাদের কিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে, কিন্তু মানুষকে পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, এবং এইরূপেই মানুষ প্রকৃত অমৃতত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে—তাঁহাদের মীমাংসার নামই উত্তর মীমাংসা। বলা বাহুল্য যে, বেদের মূল শিক্ষা সমগ্রভাবে ধরিতে না পারিয়াই এইরূপ বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল—একদল লোক কর্ম্মের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আর একদল জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের মধ্যে বস্তুতঃ এই বিরোধ নাই। গীতা বেদের মূল দৃষ্টি ভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া এই বিরোধের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। গীতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান্ অপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩।১০-১৩

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা

তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর ; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন ; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন ; দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে-ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোর। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে।"

বেদে যজ্ঞ কাহাকে বলে, গীতার এই বর্ণনা হইতে সংক্ষেপে তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং মনে হয় যে, গীতা এখানে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেই উপদেশ দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান ত কেবল প্রাচীন কালে ভারতেই প্রচলিত ছিল—তাহা হইলে গীতা কি সর্ব্ব-দেশের, সর্ব্ব-কালের মানুষের উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা দেয় নাই ? গীতার ন্যায় সার্ব্বজনীন, উদার ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। গীতা কোথাও এমন শিক্ষা দেয় নাই যাহা সকল দেশের, সকল যুগের মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। দুই এক স্থানে গীতা যে প্রাচীন ভারতের রীতি, নীতি, আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ; কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তের অন্তর-নিহিত যে শিক্ষা তাহা সর্ব্বত্রই উপযোগী। গীতা এখানে কর্ম্মের নীতি বুঝাইতেছে। কর্ম্ম কি ভাবে করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, মানুষকে ক্রমশঃ আত্মোন্নতির পথে লইয়া যাইবে—গীতা তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে গীতার শিক্ষার মূল কথাটা এই যে, এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। এখানে কেহ একা থাকিতে পারে না, জীবন-যাত্রায় কেহ একা অগ্রসর হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হয়

পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই সৃষ্টির সনাতন নিয়ম। আদি কাল হইতে এইভাবে আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই মানুষ ক্রমশঃ পরম কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জগতের যখন ইহাই সনাতন নিয়ম,—যাহারা এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, সংসার হইতে নিজের জন্য সাহায্য গ্রহণ করে, অথচ অপরের সাহায্যের জন্য কোনরূপ আত্মদান করে না—তাহারা পাপী, তাহারা চোর, তাহারা জগতের অনিষ্টের কারণ; জগতের সনাতন নিয়মের বলে তাহাদের জীবন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। অতএব, সকল সময়ে নিজেকে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই sacrifice, ইহাই উচ্চজীবন লাভের মূল নীতি। শুধু ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিও না,—জগতের কল্যাণের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য, লোক-সংগ্রহের জন্য, সর্ব্বভূতহিতের জন্য কর্ম্ম কর, তাহাই যজ্ঞার্থে কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার যে সুখ, যে ভোগ লাভ হইবে, তাহাই তোমার পক্ষে অমৃতের সমান হইবে। সেই ভোগসুখের ভিতর দিয়া তুমি সমস্ত কলুষ, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। উচ্চ জীবন লাভের এই সনাতন নীতিই যজ্ঞের রূপকের ভিতর দিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদে সর্ব্বত্রই এইরূপ পদ্ধতি। অন্তর্জীবনের কথাসমূহ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক সমস্ত যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপের এইরূপ দুইটা দিক আছে—একটা আধ্যাত্মিক, একটা বাহ্য। বাহ্যিক অনুষ্ঠান ঠিকভাবে আচরণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ভিতরের সত্যটা ফুটিয়া উঠে; এবং এইভাবে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়া মানুষ শ্রেয়ঃ পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু যাহারা বলে যে, বাহ্যিক অনুষ্ঠানই সব, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই,—নান্যদস্তীতিবাদিনঃ, তাহারা অবিপশ্চিতঃ—

অজ্ঞানী। অনেক লোকে বেদের এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করে। তাহাদের মতে অন্তর্জীবনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির কোন প্রয়োজন নাই—কেবল নিয়মমত, বিধিমত কতকগুলা যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যাইবে। কিন্তু বেদ এরূপ যাদুবিদ্যার শাস্ত্র নহে, ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রের শাস্ত্র নহে—বেদ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শাস্ত্র। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের রূপকের মধ্য দিয়া বেদ সেই জ্ঞান সকল যুগের সকল মানুষের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। গীতা বেদের অনুষ্ঠানাদির এই নিগূঢ় মর্ম্ম ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা নানা প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে। সেখানে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, এইসব বাহ্য যজ্ঞানুষ্ঠান আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তপস্যার রূপক। অগ্নিই যজ্ঞের প্রধান জিনিস, কিন্তু এই অগ্নি কেবল জড় অগ্নি নহে। গীতা কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ব্রহ্ম (৪।২৭), কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি সংযম, কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ইন্দ্রিয়। গীতার এই ব্যাখ্যা স্বকপোল-কল্পিত নহে। বেদের মধ্যেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যজ্ঞের অগ্নি কেবল জড় অগ্নি নহে, অগ্নি তপঃশক্তি, আবাহন-শক্তি, দৃষ্টিময় কর্ম্ম-শক্তি—অগ্নিই সত্য, অগ্নির দিব্যশ্রবণে বিচিত্র জ্ঞান পূর্ণ-প্রকটিত—

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। ঋগ্বেদ।

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে, তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে, একটি তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় গীতা যজ্ঞ বলিতে বেদোক্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা স্পষ্টভাবেই যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াছে। তবে তৃতীয় অধ্যায়েও গীতার ভাষা

এমন যে, সহজেই যজ্ঞকে উদার অর্থে বুঝা যাইতে পারে, এমন কি তাহা ছাড়া অন্য অর্থ করিতে গেলেই সমস্যায় পড়িতে হয়। প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন, ইহার ব্যাখ্যা করিতে কেহ বলিয়াছেন, যজ্ঞ শব্দে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম সমুদয়ই বুঝায়। আবার কেহ বলিয়াছেন এ স্থলে যজ্ঞ শব্দে স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞই * লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভগবান এই সব কর্ম্ম-তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও কষ্টকল্পিত। যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ হইতেছে আত্মোৎসর্গ, নিজেকে এবং যাহা কিছু লোকে নিজের বলিয়া মনে করে তাহা প্রেম ও ভক্তির সহিত অপরকে অর্পণ করাই যজ্ঞের মূল নীতি। সৃষ্টির প্রথমেই বিশ্বপিতা এই দিব্য নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারা লোকে ক্রমশঃ অহংভাবের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই যে পরার্থে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, ইহারই স্থূল দৃষ্টান্ত ও রূপক হইতেছে দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বৈদিক যজ্ঞ, হিন্দুর নিত্যকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এ সবই ঐ বিশ্বনীতির বিশিষ্ট প্রয়োগ বা স্থূল প্রতীক। গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। গীতার মতে সকল কর্ম্ম, সকল জীবনকেই যজ্ঞ বলিয়া দেখিতে হইবে, যজ্ঞ ভিন্ন জীবন-যাত্রা চলিতেই পারে না। তবে অজ্ঞানীরা যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া যজ্ঞ করে, 'অবিধিপূর্ব্বকম্' ; তাই তাহারা সম্যক ফল লাভ করিতে পারে না।

প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ এখানে "প্রজা" শব্দে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই

---

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

তিন বর্ণের মনুষ্য বুঝিয়াছেন। তাঁহারা যজ্ঞ শব্দের যে সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাদিগকে এই কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কারণ বৈদিক যজ্ঞাদিতে কেবল তিন বর্ণেরই অধিকার ছিল। কিন্তু এখানে ইহা অতি স্পষ্ট যে, প্রজা বলিতে সমুদয় সৃষ্ট জীবই বুঝাইতেছে। প্রজাপতি কেবল ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পতি নহেন. তিনি সকল জীবেরই পিতা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা প্রসব কর"। বিশ্বসৃষ্টি এক বিরাট যজ্ঞ, সকল বস্তুই এই যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিতেছে, একে অপরকে সৃষ্টি করিতেছে ও তাহার মধ্যে আপনার বৃহত্তর সত্তা পাইতেছে। জড় প্রসব করিয়াছে উদ্ভিদকে, উদ্ভিদ প্রসব করিয়াছে প্রাণীকে, প্রাণী প্রসব করিয়াছে মানুষকে— এখন মানুষ প্রসব করিবে অতি মানব; কেন না পার্থিব ক্রম বিবর্ত্তনের এখনও শেষ হয় নাই এবং মানুষই তাহার চরম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নহে। পৃথিবীতে যাহাতে অতি-মানবের, দেব-মানবের আবির্ভাব হয় সেজন্য মানুষকে তাহার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে ইহবে, ইহাই মানবজাতির প্রতি ভগবানের নির্দ্দেশ, ইহাতেই মানবজীবনের পরম সার্থকতা।

বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করিলে যে নানা অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। নবম অধ্যায়ে গীতা বলিয়াছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

তবে, বাসনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যাগযজ্ঞাদির দ্বারা এই যে ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখ লাভ করে, তাহা গীতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। গীতার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা হইতেছে বাসনা ত্যাগ। গীতা যে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়াছে, তাহার কাছে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ। তাহার ক্ষয় নাই, পুণ্যের শেষ হইলে সেখান হইতে পতিত হইবার কোন ভয় নাই।

বেদে যে নানা দেবতার পূজা উল্লিখিত আছে, গীতা তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই বা তাহাদের পূজা একেবারে নিরর্থক বলে নাই। তবে গীতা দেখাইয়াছে যে, ঐ সকল বিভিন্ন দেবতা সেই এক শ্রেষ্ঠ দেবতা পুরুষোত্তমেরই বিভিন্ন রূপ। যাহারা ভোগসুখের জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা করে তাহারা জানে না যে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক সেই একমাত্র ভগবান পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে—এবং তিনিই বিভিন্ন দেবতারূপে ঐ সকল ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন (গীতা ৭।২১,২২)। কিন্তু যাঁহারা সেই একমাত্র পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন—

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

বেদের রহস্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানসকল বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজও হিন্দুর জীবন মূলতঃ সেই বৈদিক যজ্ঞের আদর্শেই অনুপ্রাণিত। দেব-দেবীগণের পূজা আহ্বান হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, হিন্দু ভোগ্য বস্তু-সমূহ অগ্রে দেবতাকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ-স্বরূপ সংসারের সুখসম্পদ উপভোগ করে। দেবতাদের উদ্দেশে হিন্দুর এই যজ্ঞ আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের লোকেরা হিন্দুকে নিন্দা

করে, বলে হিন্দু বহু দেবতা, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, ইহা অজ্ঞান, কুসংস্কার। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতা বলিয়া পূজা করা অসভ্য অশিক্ষিত মনের ভ্রম, বড় জোর কবি-হৃদয়ের কল্পনা, Figures of speech, ইহার মূলে কোন সত্য নাই। এইরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভগবানের একত্বে হিন্দুও বিশ্বাস করে, ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ং হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, দর্শনেই সর্ব্বাগ্রে বলা হইয়াছে। তথাপি হিন্দু সেই বেদের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু দেবতার পূজা আরাধনা করিয়া আসিতেছে। অতি গভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে হিন্দু এই জড়-জগতের পশ্চাতে জ্যোতির্ম্ময় দেবজগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, হিন্দুর দেব-দেবার আবাধনা অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অসভ্য, বর্ব্বর জাতির ইট, পাথর, পুতুল পূজা নহে। নিতান্ত অজ্ঞ মূর্খ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলিবে ভগবান একই, তবে যে আমরা নানা দেবতার আবাধনা করি, সে-সব সেই একই ভগবানের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন রূপ মাত্র। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সবই এক। ইহা সেই বেদেরই অতি প্রাচীন্ কথা,—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। এই একের বহুরূপ, বহুর একত্ব হিন্দু অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে; কিন্তু হিন্দুর কাছে যাহা সহজ, পাশ্চাত্য বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরাও তাহা ধারণা করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও সংস্কাবের অনুসরণে বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলেন।

আজ জড়-বিজ্ঞানও সেই প্রাচীন বৈদান্তিক সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে একই শক্তি, Energy, ক্রিয়া করিতেছে। শক্তি (Energy) এবং জড় (Matter) এই দুইটী

মূলতঃ এক বলিয়া বুঝা যাইতেছে, শক্তির একটি বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা হইতেছে জড়। বিদ্যুৎ, চৌম্বক শক্তি, আলো, তাপ, গতি সবই সেই এক মূল শক্তির বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া। বিদ্যুৎ হইতে গতি উৎপন্ন হইতেছে, গতি হইতে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাপ হইতে গতি, গতি হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, এই সকল শক্তির আদান-প্রদানের দ্বারাই এই আশ্চর্য্যময় জগৎব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু এই যে মূল বিশ্ব-শক্তি বিভিন্ন নাম ও রূপের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকট করিতেছে, বিজ্ঞান কেবল ইহার বাহ্যিক যান্ত্রিক (Mechanical) ক্রিয়াটিরই সন্ধান পাইতেছে এবং সেই যান্ত্রিক ক্রিয়ার ধারাগুলিকেই Laws of Nature, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বলিয়া আবিষ্কার করিতেছে। কিন্তু এই ক্রিয়ার পিছনে যে চৈতন্য রহিয়াছে, বিজ্ঞানের টেলিস্কোপ্ বা মাইক্রোস্কোপে তাহা ধরা পড়ে না। চৈতন্যকে আমরা জানিতে পারি কেবল অনুভূতি দ্বারা, কোন যন্ত্রের দ্বারা নহে। যখন আমরা এই আদ্যাশক্তির সহিত ঐক্যানুভূতিতে এক হই, তখন ইহার গভীরতম রহস্যগুলি অবগত হইতে পারি, এবং সেজন্য আমাদিগকে আমাদের নিজেদের চৈতন্যেরই গভীরে যাইতে হয়, কারণ আমাদের চৈতন্য ঐ বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত মূলতঃ এক। ইহাই বৈদান্তিক জ্ঞানের প্রণালী, এবং এই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জগৎ সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমাদের শারীরিক অনেক ক্রিয়াই অভ্যাস বা সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হয়, আমাদের চৈতন্য সেখান হইতে সরিয়া থাকে, এবং তাহাতে দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। ঠিক সেইরূপেই যে চৈতন্যময়ী শক্তি এই বিশ্বরূপে প্রকট হইতেছেন, নিজের গভীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই তিনি নিজেকে রাখিয়াছেন পিছনে, বাহিরের ব্যাপারকে যন্ত্রবৎ নিয়মানুসারে চলিতে দিতেছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত

জগতের প্রত্যেক ক্রিয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে চৈতন্য। এই যে-সকল চৈতন্যময় শক্তি জাগতিক ব্যাপারসমূহের অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ইহারাই দেবতা। এইসব এক ভাগবত শক্তি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বিভাব। গীতায় দেবগণ এইরূপই বিশ্বশক্তি, তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর দেবতা নহেন। তাঁহারাই বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতের সকল ব্যাপার সংগঠিত ও পরিচালিত করিতেছেন, ভাগবত শক্তির সহকারী-রূপে এই আশ্চর্য্য-ময় বিশ্বনাট্যের অভিনয় করিতেছেন।

দেবগণ হবির্ভোজী, মানুষ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়া দেবগণকে পুষ্ট করিবে, প্রতিদানে দেবগণ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা মানুষকে পুষ্ট করিবেন, ইহাই বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের বাহ্য তত্ত্ব। কিন্তু এই বাহ্য তত্ত্বের পশ্চাতে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব ছিল, কালক্রমে লোকে তাহা হারাইয়া ফেলে, "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ", গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার নূতন করিয়া যজ্ঞতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার মতে এই অনুষ্ঠানটি একটি গভীর অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীক বা রূপক। চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে, যে-অগ্নিতে হোম করিতে হইবে তাহা জড় অগ্নি নহে, তাহা ব্রহ্মাগ্নি. তাহাতে যে ঘৃত আহুতি দিতে হইবে সে ঘৃতও ব্রহ্ম। বস্তুতঃ বেদের ভাষা এবং বৈদিক অনুষ্ঠানসকল ছিল রূপকাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে সোমরস ছাঁকিয়া পান করিবার কথা আছে।

তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচন্তো
অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্॥ ঋগ্বেদ ৯।৮৩।২

—"তাঁহার তপ্ত সুরা যাহাতে ছাঁকিয়া শুদ্ধ করা হয়, সেই ছাঁকুনি বিস্তৃত রহিয়াছে স্বর্গে (দিবস্পদে—In the seat of Heaven), ইহাতে জ্যোতির্ম্ময় তন্তুসকল সাজান রহিয়াছে।"

ছাঁকুনির বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় যে, বেদে যে সোমরসের কথা আছে তাহা বাস্তবিকই উপমা মাত্র, রূপক, কারণ প্রকৃত পার্থিব সোমমদিরা ছাঁকিবার যন্ত্র স্বর্গে কেন পাতা থাকিবে এবং তাহার তন্তুসকল কেন আলোকরশ্মি বিতরণ করিবে? এখানে যে জ্যোতির্ম্ময় ছাঁকুনির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ হৃদয়ের রূপক এবং ঐ ছাঁকুনির তন্তুসকল হইতেছে শুদ্ধ চিন্তা ও শুদ্ধ ভাব। শুদ্ধ মনকে দ্যৌ বা স্বর্গ বলা হইয়াছে, কারণ স্বর্গ যেমন পৃথিবীর উপরে, পৃথিবীর অপবিত্রতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই শুদ্ধ মনও দেহ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ও শিহরণ হইতে মুক্ত, প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত। আমাদের সাধারণ হৃদয় মন ভোগ্য বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া উঠে, এইরূপ অক্ষম অশুদ্ধ হৃদয়-মন লইয়া জীবনের প্রকৃত গভীর আনন্দ ভোগ করা যায় না। সাধনার দ্বারা, সংযম অভ্যাসের দ্বারা, হৃদয় মনকে শুদ্ধ, শান্ত, রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের যে তীব্র, গভীর, অফুরন্ত বিশুদ্ধ আনন্দ তাহা উপভোগ করিতে পারা যাইবে।

জগতে অনুস্যূত যে আনন্দধারার রূপক সোমরস, বেদে তাহাকেই সোমদেব বলা হইয়াছে। কিন্তু এই আনন্দধারা সর্ব্বত্র বিস্তৃত, অরূপ, নিরাকার, Impersonal। ইহা ছাড়া সোমদেবের সাকার রূপও আছে. সোমদেব নিরাকার আনন্দধারাও বটেন আবার সাকার দিব্য পুরুষও বটেন। বেদে অন্যান্য দেবতাদেরও এইরূপ দুইটি দিক আছে, যথা, অগ্নি জগতের সর্ব্ব বস্তুর অন্তস্থলে রহিয়াছে, যাহা বাহ্য জগতে অগ্নি ও জ্যোতিরূপে প্রকট তাহাই আবার মানুষের হৃদয়ে তপস্যার শিখারূপে, ভগবদ্‌মুখী আকাঙ্ক্ষা ও দিব্য ইচ্ছাশক্তিরূপে বিরাজিত; আবার সাকার (Personal) অগ্নি-দেবতাও রহিয়াছেন। মানুষ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে সম্বর্দ্ধিত করিবে, ইহার নিগূঢ় অর্থ এই

যে, মানুষের মধ্যে যে-সকল দিব্য শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, আত্মোৎসর্গের দ্বারা সে-সকলকে পুষ্ট ও বিকশিত করিবে। বেদের মধ্যে একটি কথা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, "দেবানাং জনিমানি"। ইহার অর্থ হই-তেছে, জগতের মধ্যে বিভিন্ন ভাগবত ধর্ম্মের (Divine Principles), ভাগবত শক্তির প্রকাশ, বিশেষতঃ মানুষেব মধ্যে বিভিন্নরূপে ভগবানের প্রকাশ। মানুষ মূলতঃ ভাগবত সত্তা, ভগবানেরই অংশ। কিন্তু মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের যে সাধারণ ক্রিয়া তাহা অজ্ঞান, অপূর্ণ, বিকৃত। নীচের প্রকৃতির এই সকল বিকৃত ক্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য সত্য, দিব্য শক্তি, দিব্য আনন্দের ক্রিয়াব বিকাশ করিতে হইবে। ইহার জন্য মানুষেব মধ্যে বিভিন্ন দেবরূপে ভগবানের যে আবির্ভাব, তাহাকেই বেদে "দেবতাদেব জন্ম" বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিশেষ স্তরের, বিশেষ ধর্ম্মের দেবতা আছেন--মনবুদ্ধির দেবতা ইন্দ্র, ইচ্ছাশক্তির দেবতা অগ্নি, আনন্দের দেবতা সোম। আমরা যখন ভগবানের চবণে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করি, দিব্য জীবন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপ প্রজ্জলিত অগ্নিশিখায় কাম ক্রোধাদি নীচের প্রকৃতির ক্রিয়া-সকলকে আহুতি দিই, তখন আমাদের মধ্যে দেবগণ অর্থাৎ ভাগবত শক্তি-সকল সম্বর্দ্ধিত হন, এবং সেই সকল শক্তি আমা-দিগকে দিব্য জীবনে গড়িয়া তোলেন, আমরা পরম শ্রেয় লাভ করি।

"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ"। এই যে পরস্পরকে সম্বর্দ্ধিত করিবার কথা ইহার দ্বারা গীতা একটি গভীর বিশ্ব-সত্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার চলিতেছে এই আদান-প্রদানের দ্বারা। দেব, মানব, প্রাণী উদ্ভিদ্, জড় সবের মধ্যেই চলিতেছে এই যজ্ঞ-ক্রিয়া। আধুনিক বিজ্ঞান জড়-জগতের যে সূক্ষ্মতম উপাদান ইলেকট্রন ও প্রোটনের সন্ধান পাইয়াছে, তাহারাও কেহ একক থাকিতে পারে না, পরস্পরের সহিত আদান প্রদানের দ্বারাই তাহারা প্রাকৃতিক ব্যাপারসকল সংঘটন

করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছে, নতুবা এই বিশ্ব এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে, সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে। মাটি জল বায়ু হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষলতা জীবজন্তুর আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে, জীবজন্তু মরিয়া বৃক্ষলতার সার হইতেছে। ইহাই প্রবর্ত্তিত জগৎচক্র। এই আদান-প্রদান মানব-সমাজেরও ভিত্তি। জনক-জননীর আত্মদানে সন্তানের সৃষ্টি হইতেছে. সন্তানের মধ্যে তাঁহারা আবার নূতন জন্ম লাভ করিতেছেন। যখন আমরা কাহারও শুভ কামনা করি, তাহার ত শুভ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শুভ হয়। মানব-সমাজে এই আদান-প্রদানের নীতি যেদিন চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে, সেইদিন এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আজ মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য যে বিপুল প্রয়াস করিতেছে, স্বার্থচিন্তা ভুলিয়া সকলেই পরের জন্য যখন সেই প্রয়াস করিবে, তখন আর কাহারও কোন অভাব থাকিবে না, এই সংসার হইতে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবে, এই সংসারই হইবে প্রেমের রাজ্য। ভূতলে এইরূপ প্রেমের, শান্তির, আনন্দের রাজ্য, রাজ্যং সমৃদ্ধং, স্থাপন করাই গীতা-শিক্ষার নিগূঢ় লক্ষ্য।

গীতা অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান দিয়াছে, দিব্য জীবন লাভের পথ দেখাইয়াছে ; তাই নীচের স্তরের বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু, নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে এইরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা সর্ব্বদা নিজেদের ভোগ সুখের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া যাইতেছে তাহারা ঘোর পাপী—অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ। এই স্তরের উপরে উঠিতে হইলে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের নীতি অবলম্বন করিতে হয়। দেবতাগণকে অর্পণ

করিয়া যে কামোপভোগ করা যায় তাহা উচ্চ স্তরের, তাহা একেবারে অবিমিশ্র কামপরায়ণতা নহে। ইহারও উপরে উঠিতে হইলে কামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে এবং এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যায়—পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। গীতা এই শেষোক্ত কর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছে। শেষ প্রকারের কর্ম্মকেও যজ্ঞ বলা যাইতে পারে এবং গীতার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। সাধারণ যজ্ঞে আমরা বাসনা কামনা সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করি। কিন্তু, ক্রমশঃ এইভাবে দেবোদ্দেশে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়, জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ আমরা উপলব্ধি করি যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই, আমরা কিছুই করি না, প্রকৃতিই সব করিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে সে সমস্তই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞের ফলভোক্তা আমরা নই, সে যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমরা আমাদের মূল সত্তায় সেই ভগবানের সহিত এক,—আমাদের প্রকৃতি বিশ্ব প্রকৃতিরই একটা যন্ত্র বা একটা আধার। আমাদের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নানা কর্ম্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, ভগবান তাহার ফল ভোগ করিতেছেন—যখন আমাদের ইহা উপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তখনই আমাদের হয় শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

গীতা বৈদিক যজ্ঞকে এইরূপে গূঢ়, উদার, বিস্তৃত অর্থ দিয়াছে। বাহ্যিক যজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা পরম গতি লাভ করা যায়—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৪।৩০,৩১

অতএব, গীতোক্ত শিক্ষায় অতি বাহ্যিক বৈদিক যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানও বর্জ্জিত হয় নাই--গীতা কেবল তাহাদের স্থান ও উপযোগিতা দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষ যখন নীচের স্তরে রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে, ভিতরের দিকে ফিরিবার অভ্যাস নাই, ক্ষমতা নাই, আত্মার সন্ধান যখন সে পায় নাই, আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় নাই—তখন তাহার এই ইন্দ্রিয়লালসাকে নিয়মিত ও সংযত করিতে হইবে বাহ্যিক যজ্ঞের দ্বারা। কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত কর্ম্ম না করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে পূজাদিরূপে কিছু ত্যাগ করিয়া দেবতাদের দান স্বরূপ কামোপভোগ কর। এইরূপে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান-লাভ করিবে। তখনই এই বাহ্যিক যজ্ঞের অন্তরালে যে নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া অমৃতের, অর্থাৎ দিব্য ভোগ, দিব্য আনন্দের অধিকারী হইবে।

গীতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে সংযত করিবার উপায়স্বরূপ কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞেরই নির্দ্দেশ করিত, তাহা হইলে গীতার শিক্ষা সার্ব্বজনীন হইত না। কিন্তু, গীতা তাহা করে নাই। গীতা কেবল বলিয়াছে নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্—"নিয়তং" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিশৃঙ্খলভাবে কর্ম্ম না করিয়া, কোন উচ্চ আদর্শ কোন বিধি বা ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসমূহকে নিয়মিত সংযত কর। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এইরূপ নিয়ত কর্ম্মের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে ব্যক্তি বেদের কোন খবরই রাখে না, বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠান কখনও করে নাই, সে যদি দেশের হিতের জন্য নিজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, দরিদ্র সেবা, আর্ত্তের সেবা, সর্ব্বভূতের সেবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সংযম স্বীকার করে, এইরূপ যে কোন

উচ্চ আদর্শ বা নীতি অনুসরণ করিয়া নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করে, নিয়মিত করে—তাহাকেই "নিয়ত কর্ম্ম" বলা যায়। এইরূপ নিয়ত কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন কর্ম্ম-সকল আর কোন বিশেষ শাস্ত্র কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা আদর্শের দ্বারা নিয়মিত করিতে হয় না, তখন সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপরে উঠা যায়, তখন স্বয়ং ভগবান সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ম্ম-সকলকে নিয়মিত করেন। তখনই আমাদের সমস্ত কর্ম্মফল, সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়, তখনই আমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

উপনিষদের যুগে একদিকে একদল লোক বাহ্য যাগযজ্ঞাদি বাহ্য-কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; আর একদল লোক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসার পবিত্যাগ কবিয়া জ্ঞানের আলোচনাকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু, ইহার কোনটিই বেদের প্রকৃত আদর্শ নহে। বেদ শুধু বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদির শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেই চরম বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে নাই। উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানেব আলোকে কেমন করিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে, কর্ম্মকে আলোকিত করিতে হয়—ভগবানের দিব্যগুণ, দিব্য-শক্তিসকলের (ইহারাই দেবতা) আরাধনা করিয়া মানুষের মধ্যেই তাহাদের বিকাশ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবজীবন লাভ করিয়া ইহলোকেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়—তাহার ব্যব-হারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল বেদের নিগূঢ় লক্ষ্য। বেদের এই মহান আদর্শ অনুসরণ করিয়াই গীতা অপূর্ব্ব যোগ-সাধনার রহস্য প্রচার করিয়াছে।

উপনিষদ ও গীতা

দর্শনশাস্ত্রের দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া যদি ভগবান লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সে-চেষ্টা অতি দুঃসাধ্য বলিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দিবেন। সমাজে মানুষে মানুষে যে মধুর সম্বন্ধ তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, সংসারে কর্ম্ম করিতে মানুষ যে অপার আনন্দ পায় তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কোন নির্জ্জন আশ্রমে শ্রীগুরুর পদ-প্রান্তে বসিয়া ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে, এবং নিশ্চল নির্ব্বিকল্প সমাধির সাধনা করিতে হইবে*—ইহাই যদি ভগবান লাভের পথ হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ মানুষই যে সেই পথকে দূর হইতে নমস্কার করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক; অথচ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র মানুষকে এই পথই দেখাইয়াছে। গীতা বলিয়াছে, ইহা যে ভগবান লাভের পথ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে ইহা বড় কষ্টের পথ, গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। ইহা ছাড়া সুখের পথও আছে; তাহাও সনাতন পথ—সুসুখম্ কর্ত্তুমব্যয়ম্। সেই পথ দেখাইয়া দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য।

সেই পথ কি? নির্গুণ, নিরাকার, বিশ্বলীলার অতীত, অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মে মনোনিবেশ করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু, সকলের উপরে যে ভগবান পুরুষোত্তম, তিনি লীলাময় পরম পুরুষ। সমস্ত জগতের

* আচার্য্য শঙ্কর এই শিক্ষাটিই বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন—
নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥

লীলাকে তিনিই পরিচালনা করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন ; তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া আমাদের ভিতর দিয়াই জীবনলীলার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তমের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হইতে হইবে, সজ্ঞানে তাঁহার লীলার সাথী হইয়া জীবনের দিব্য আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে—ইহাই পরমা গতি। এই পরমা গতি লাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল চাই দিব্য-জীবন লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমের হস্তে সমর্পণ করা, তাঁহার সহিত সকল প্রকার মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করা, গুরুরূপে, পিতারূপে, সখারূপে, প্রিয়তম প্রেমাস্পদ-রূপে, সর্ব্বভাবে, তাঁহারই উপাসনা করা। তাহার পর যাহা কিছু করিবার তিনিই করিয়া দিবেন—অহং ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতা বলিয়াছে, এই যে পরম সুখের পথের সন্ধান সে দিতেছে, ইহা নূতন নহে, ইহা পুরাতন পথ। তবে লোকে ইহা কালক্রমে হারাইয়া ফেলিয়াছে—স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ। এই পথ যে সনাতন পথ, তাহাই দেখাইবার জন্য গীতা সকল আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের মূল, সনাতন সত্য-সমূহের আকর বেদ ও উপনিষদের শরণ লইয়াছে, সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া গীতা তাহারই উপর জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-সমন্বয়যোগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গীতা কেবল তত্ত্ব-সংগ্রহের গ্রন্থ নহে, শুধু দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা গীতায় কোথাও বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। গীতা ভগবান লাভের, দিব্য-জীবন লাভের যে পথটি দেখাইয়াছে, লোকে যাহাতে সে পথটি বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে, শুধু সেই উদ্দেশ্যেই গীতায় সর্ব্বশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। বেদ, উপনিষদাদি বিরাট শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের মন যে বিক্ষিপ্ত হয়, বিরক্ত হইয়া উঠে, গীতা তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে,—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না। গীতা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছে

যে ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়াছে—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা—তিনি শব্দব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদকে অতিক্রম করিয়াছেন; যিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদ-সকলের কোন প্রয়োজন নাই। বেদাদি শাস্ত্র কেবল ভিতরের জ্ঞান জ্বালিয়া দিবার সহায় মাত্র। যতটুকু তত্ত্বের সাহায্য লইয়া ভিতরের এই জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিতে হয়, গীতা সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া সেই সারতত্ত্বটুকু মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছে।

গীতাকে উপনিষদ বলা হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গীতা উপনিষদ নহে। বৈদিক যুগের শেষে উপনিষদের যুগ; তাহার বহুকাল পরে গীতা রচিত হইয়াছে। গীতার রচনা-প্রণালী ও প্রকাশভঙ্গী উপনিষদ হইতে বিভিন্ন। গীতা যে উপনিষদের ন্যায়ই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; পরবর্ত্তী ভারতের সকল দার্শনিক সম্প্রদায়, ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠার জন্য গীতার উপর নির্ভর করিয়াছে। তথাপি বস্তুতঃ গীতা বেদ উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে।

উপনিষদ কি? বেদের শেষাংশের নামই উপনিষদ, এই জন্যই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ সাধনার বলে যে সত্যসমূহ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা মন্ত্রে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মন্ত্র-সমষ্টিই বেদ। ঋষিগণ এই সত্যের সৃষ্টি করেন নাই। সত্য অপৌরুষেয়, নিত্য, সনাতন—তাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এই জন্যই বেদকে অপৌরুষেয়, অনাদি, অনন্ত বলা যায়। ঋষিরা কেবল তাহার মুখপাত্র বা প্রকাশের যন্ত্র। সত্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ যে দিব্যবাণী, সাধক ঋষিরা তাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন; তাই তাঁহাদের নাম মন্ত্রদ্রষ্টা এবং তাঁহাদের লব্ধ

জ্ঞানের নাম শ্রুতি।* বেদের মন্ত্ররাজি সংগৃহীত হইয়া কালক্রমে চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—ঋক্, সাম, যজু এবং শেষ অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদের আছে মোটামুটি দুইটি অংশ, এক সংহিতা, আর এক ব্রাহ্মণ। সংহিতা হইতেছে মন্ত্রসমষ্টি, মূল বেদ। ব্রাহ্মণ এই মূল-মন্ত্রেরই ভাষ্য, ব্যাখ্যা বা নূতন সংস্করণ। বেদের মূলমন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই স্থূল রূপক ও উপমার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক জগতের সত্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং সেই সকল সত্যকে অবলম্বন করিয়া কেমন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়, যজ্ঞাদি বাহ্য প্রতীকের দ্বারা তাহাই স্থূলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে বেদের ভিতরের গূঢ় আধ্যাত্মিক দিকটা চাপা পড়িয়া যায়, বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডের দিকেই লোকের দৃষ্টি পড়ে। ব্রাহ্মণে এই কর্ম্মকাণ্ডই বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষের দিকে আবার বেদের গূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর ঝোঁক পড়ে এবং তাহাই উপনিষদ। উপনিষদ বেদের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবহুলতাকে নীচে স্থান দিয়াছে। ব্রাহ্মণে বেদের বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদির উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণকে বলা হয় বেদের কর্ম্মকাণ্ড। আর, উপনিষদ ধরিয়াছে বেদের ভিতরের দিকটা; বেদের যে মূল তত্ত্বজ্ঞান উপনিষদ তাহা লইয়াই ব্যাপৃত। এই জন্যই উপনিষদকে বলা হয় বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের শিক্ষা লইয়া কালক্রমে এই যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ উঠে, গীতা কিরূপে তাহার সমাধান করিয়াছে আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছি। এখন উপনিষদ অর্থাৎ বেদের জ্ঞান-কাণ্ড হইতে গীতা তাহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমেই

* মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা - শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত

আমরা মোটামুটি ভাবে বলিয়া রাখিতে পারি যে, গীতার সমস্ত তত্ত্বই উপনিষদ হইতে গৃহীত। তবে গীতা সেগুলিকে নূতন ভাবে, যুগোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছে; এবং সেই সব তত্ত্ব অনুসারে কার্য্যতঃ জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহারই বিশদ উপদেশ দিয়াছে।

Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া সত্যকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু উপনিষদের প্রণালী সেরূপ নহে। উপনিষদ দর্শনশাস্ত্র বা Philosophy নহে—উপনিষদ শ্রুতি, বেদ। উপনিষদের ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যকে যেমন দেখিয়াছেন, অতি সংক্ষিপ্ত সাবালো ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সে-ভাষা সত্যেরই বাঙ্ময় রূপ। যাহাদের হৃদয় মন প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ভাষার দিব্য স্পন্দনে তাহাদের অজ্ঞান আবরণ দূর হইয়া যায়, তাহারা অন্তরের মধ্যেই ঐ সত্যের উপলব্ধি লাভ করিয়া ধন্য হয়। আজকাল লোক শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারাই সত্যকে জানিতে চায়। কিন্তু আমাদের চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও আমাদিগকে প্রতারিত করে, অনুমান ও যুক্তিতেও পদে পদে ভ্রমের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার অনুমানগুলিকে অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া লয় তথাপি তাহা সম্পূর্ণভাবে ভ্রমের হাত এড়াইতে সক্ষম হয় না। আর যে-সব বস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত, প্রত্যক্ষের সহিত যেখানে অনুমানকে মিলাইয়া লওয়া সম্ভব নহে, সেখানে অনুমানকে সত্যের প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কিছুতেই চলে না। এই জন্যই ভারতে অধ্যাত্ম বিষয়ে শ্রুতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,

স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।

সূর্য্য যেমন স্বয়ং-প্রকাশ, তাহাকে দেখিবার জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না, শ্রুতিবাক্যও তেমনিই নিজেই নিজের প্রমাণ। উহা শ্রবণ করিবামাত্র আমাদের অন্তরে উহার সত্যতার উপলব্ধি আপনা হইতেই আইসে। উপনিষদের ঋষি যখন বলেন,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

অথবা

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

তখন আর আমাদের সন্দেহের স্থান থাকে না যে, আমরা অমৃতের পুত্র এবং ঋষি যে মহান পুরুষকে জানিয়াছেন তাঁহাকে অবগত হইয়াই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিব।

এইরূপ মন্ত্রই হইতেছে কবিতার প্রকৃত স্বরূপ, কবি শব্দের অর্থ হইতেছে দ্রষ্টা, তিনি সত্যকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন এবং ছন্দোবদ্ধ বাক্যের স্পন্দনের ভিতর দিয়া অপরকেও সেই সত্যের সাক্ষাৎ অনুভূতি আনিয়া দেন। কিন্তু এইরূপে মন্ত্রোপলব্ধির জন্য প্রথমে যোগ্যতা অর্জ্জন করা চাই। যদি কোন অশিক্ষিত লোককে বলা যায় যে, আকাশে এখন সে যে নক্ষত্রটি দেখিতেছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ঐখানে ছিল, তাহার আলো আমাদের নিকট আসিতে এতকাল লাগিয়াছে, ইতিমধ্যে নক্ষত্রটি কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে—তাহা হইলে সে কি ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? অথচ যাহারা বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কিছুই কষ্টকর নহে। অধ্যাত্ম সত্য উপলব্ধির জন্যও শিক্ষা ও সাধনা চাই, ভারতে সেই শিক্ষারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। এই

শিক্ষা দ্বারা শুদ্ধ ও বুদ্ধ হইয়া বেদ ও উপনিষদের বাণীর সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায় এবং তাহাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। যাঁহারা বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে চান, উপনিষদ তাঁহাদের জন্য রচিত নহে। কিন্তু, যে-সকল সাধক বেদ-বেদান্তের ভাবধারার সহিত পরিচিত এবং নিজেরাও জীবনে সত্যের কিছু উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দেওয়াই উপনিষদের লক্ষ্য। অতএব, উপনিষদে চিন্তাধারার ধারাবাহিক বিকাশ করা হয় নাই, যে-সকল সত্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে বিশদভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। উপনিষদের মধ্যে এমন সব কথা আছে যাহা কেবল সঙ্কেত বা ইঙ্গিত মাত্র, পাঠক বা শ্রোতা ঐ ইঙ্গিত অনুসারে নিজেরাই সত্যকে ধরিবার সাধনা করিবে, নিজেদের অনুভূতি উপলব্ধি উপ-নিষদের সহিত মিলাইয়া দেখিবে, উপনিষদের সত্যের সমর্থন নিজেদের উপলব্ধির মধ্যে পাইবে, নিজেদের অনুভূতির সমর্থন উপনিষদের মধ্যে পাইবে—এইরূপে সত্য হইতে সত্যে, আলোক হইতে আলোকে অগ্রসর হইবে—ইহাই উপনিষদসমূহের সাধারণ লক্ষ্য। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে এইভাবের শিক্ষা উপযোগী নহে। বর্ত্তমানে মানুষ বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষিগণের অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছে, মানসিক বুদ্ধি ও বিচারই তাহার প্রধান অবলম্বন—এই জন্য বর্ত্তমানে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র Philosophy বা দর্শনশাস্ত্ররূপে দেখা দিয়াছে। এখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিচয় প্রথমে বিচার-তর্কের দ্বারা মানুষকে দিতে হইবে, যেন মানুষ চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। গীতায় বেশীর ভাগ এই ধারাই অবলম্বিত হইয়াছে। অবশ্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিলব্ধ সত্যই গীতা-শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু গীতা উপনিষদের ন্যায় আপ্তবাক্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ নহে, গীতা যুক্তি-

তর্কের সাহায্যে বক্তব্যগুলি শিষ্যের বুদ্ধিগোচর করিবার চেষ্টা করিয়াছে—এইজন্য গীতাকে বেদ ও উপনিষদের ন্যায় শ্রুতির মধ্যে বস্তুতঃ গণ্য করা যাইতে পারে না। তথাপি গীতার বাক্যের মধ্যেও মন্ত্রশক্তি নিহিত আছে। গীতার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিতর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত অথচ সে-সব এমন কবিত্বময় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, সে-সবের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়ই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই জন্যই গীতা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য। দার্শনিক তত্ত্বসকলকে এমন কবিত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করার দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যে আর কোথাও মিলিবে না। গীতায় বিশ্বরূপের বর্ণনা অনির্ব্বচনীয় সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করিবার এক অপরূপ নিদর্শন। গীতা পড়িতে পড়িতে অর্জ্জুনের ন্যায়ই বার বার বলিতে ইচ্ছা হয়,

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

—"হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলিতেছ সবই আমার সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।"

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।

"আবার বল, তোমার অমৃতময় বাক্য শুনিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না।"

তবে, গীতাও সকল সত্য সম্যক পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করে নাই, তাহা সম্ভবও নহে। গীতার মধ্যে এমন সব সত্যের ইঙ্গিত ও সঙ্কেত-মাত্র আছে, যাহা হইতে পরবর্ত্তী যুগে নূতন নূতন সাধন প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। গীতার যাহা শ্রেষ্ঠ রহস্য,—উত্তমম্ রহস্যম্, গীতা কোথাও তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেয় নাই, কেবল ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। সাধকগণকে নিজেদের জীবনে সাধনার দ্বারাই তাহার পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করিতে হইবে। গীতা বস্তুতঃ বেদের শেষাংশ বা উপনিষদের অন্তর্গত না হইলেও, গীতার সম্মান এত অধিক যে গীতা

ত্রয়োদশ উপনিষদরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েব শেষে আছে—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু। এই সঙ্কল্প মূল মহাভারতে নাই। যখন নিত্যপাঠের জন্য গীতাকে মহাভারত হইতে পৃথক কবিয়া বাহির করা হয়, বোধ হয় তখন হইতেই এই সঙ্কল্প প্রচলিত। উপনিষৎ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই জন্যই "গীতম্" না হইয়া "গীতা" হইয়াছে।

গীতার অনেক স্থলেই উপনিষদেব সহিত শব্দ-সাদৃশ্য আছে; এবং গীতার কোন কোন শ্লোক বা শ্লোকাংশ সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উপনিষদে এই চরাচর বিশ্ব জগৎকে বুঝাইতে "সর্ব্বমিদং" এই কথাটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; গীতার মধ্যে আমরা ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই—ময়ি সব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। উপনিষদ বলিয়াছে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, গীতা বলিয়াছে বাসুদেবঃ সব্বম্। এই সম্পর্কে লোকমান্য তিলক তাঁহার গীতারহস্যে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মার অশোচ্যত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার এবং বিশেষ করিয়া 'জ্ঞেয়' পরব্রহ্মের স্বরূপ—এই সমস্ত বিষয় গীতায় অক্ষরশঃ উপনিষদেব ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে। কোন উপনিষদ গদ্যে এবং কোন উপনিষদ পদ্যে রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি তেমনি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে; তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা নাই (গী ২।১৬), যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং (গী ৮।৬) ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে; এবং 'ক্ষীণে পুণ্যে', 'জ্যোতিষাং জ্যোতি' এবং 'মাত্রাস্পর্শাঃ' ইত্যাদি বিচার ও বাক্য বৃহদারণ্যক হইতে লওয়া হইযাছে। কিন্তু গদ্যাত্মক উপনিষদ ছাড়িয়া

পদ্যাত্মক উপনিষদ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। কারণ এই পদ্যাত্মক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক যেমন তেমনটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—কঠোপনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিম্বা অল্প শব্দভেদে গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি" শ্লোক কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর "আশ্চর্য্য বক্তা" (২।৭) শ্লোকের সমান, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"* (গী ২।২০) শ্লোক এবং "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (গী ৮।১১) এই শ্লোকার্দ্ধ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ একই। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু" গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হইতে গৃহীত। সেইরূপ গীতার পনেরো অধ্যায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপকটি কঠোপনিষদ হইতে এবং "ন তদ্-ভাসয়তে সূর্য্যঃ" শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে অল্প শব্দ ভেদে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ আবার "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" শ্লোক এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধও, গীতায় ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শব্দশঃ পাওয়া যায় এবং "অণোরণীয়াংশং" এবং "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পদও গীতায় (৮।৯) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৩।৮) একই আছে। ইহা ব্যতীত গীতার ও উপনিষদের শব্দসাদৃশ্য দেখিতে গেলে সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং এবং বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো এই শ্লোকার্দ্ধ কৈবল্যোপনিষদে যেমনটি তেমনি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দসাদৃশ্য

---

* ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

কঠোপনিষৎ ২।১৮

সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, গীতার বেদান্ত উপনিষদ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা কেবল উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন বা তত্ত্বসংগ্রহ নহে। উপনিষদ হইতে নানা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তদনুসারে গীতা নিজস্ব যোগ প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ; গীতা উপনিষদের ও দর্শনের বিভিন্ন মত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে এক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে ; এবং ইহার জন্য গীতাকে কোথাও এই সব তত্ত্বকে বিশদ করিয়া পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে এবং নূতন তত্ত্বের যোজনা করিতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদ দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় বিচার-যুক্তির গ্রন্থ নহে ; সেখানে আছে শুধু সত্যের ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ ; কিন্তু কোন বিষয়কে বিশদ ভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হয় নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, এক উপনিষদকে ভিত্তি করিয়াই সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি নানা মত, নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্," ইহা দেখিয়া মানুষের মন-বুদ্ধি স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত হইতে পারে, মানুষ হতাশ হইয়া দিব্যজীবন লাভের চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে পারে ; সেই জন্যই গীতার লক্ষ্য এই সকল বিভিন্ন মতের বিরোধ দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে এক উদার সমন্বয় স্থাপন করা এবং সেই সমন্বয়ের উপর তাহার যোগপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করা। এই সমন্বয় সাধনের জন্যই গীতা প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রগুলির পশ্চাতে যে উপনিষদ-সমুহ রহিয়াছে সেইখানেই গমন করিয়াছে এবং মুল উপনিষদের শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য করিয়াছে। উপনিষদই মুল বেদান্ত এবং এই বেদান্তকে ভিত্তি করিয়া গীতা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া গীতার দার্শনিক মত মূলতঃ বৈদান্তিক। কিন্তু, এই বৈদান্তিক কাঠামোর মধ্যেই গীতা অন্যান্য মতের এমন

উদার সমন্বয় করিয়াছে যে, ভারতের সমস্ত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের সার বস্তুটুকু গীতার শিক্ষার মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে।

গীতা সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, যোগের ঈশ্বর—এই সকল তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছে ; এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় করিবার জন্য নিজস্ব পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিকাশ করিয়াছে। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সন্ধান উপনিষদের মধ্যেই আছে ; কিন্তু উপনিষদে আছে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র ; এমন কি মনে হয় যে, উপনিষদের যে পুরুষ-তত্ত্ব তাহা গীতার বিরোধী ; কারণ উপনিষদে পুরুষ দুই বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, গীতায় পুরুষ তিন। গীতা এই তিন পুরুষের সন্ধান কোথায় পাইয়াছে, এবং কিরূপে ইহার দ্বারা গীতা ঈশ্বরতত্ত্বের সমাধান করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলেই গীতার প্রণালীটি বেশ বুঝা যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা কোথাও শুধু দার্শনিক তত্ত্বের সমাধান করিবার জন্যই তত্ত্বালোচনা করে নাই। গীতা যে সাধনার প্রণালী দেখাইয়াছে, তাহারই প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রসমূহে জ্ঞানের দিকেই ঝোঁক পড়িয়াছিল ; এবং কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস, জ্ঞানচর্চ্চার ভিতর দিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছিল। গীতা দেখাইয়াছে এই পথ অতি দুরূহ। সকল সম্বন্ধবিহীন, বিশ্বাতীত, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ সাধারণ দেহধারীর পক্ষে সম্ভব বা সহজ নহে। তাই গীতা জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তির পথ যোগ করিয়াছে। ভগবান আমাদের সকল সম্বন্ধের অতীত নহেন ; সকল সম্বন্ধের অতীত নির্গুণ অক্ষর অবস্থা ভগবানের কেবল একটা দিক মাত্র। কিন্তু ইহার উপরে আছে যে অবস্থা, তাহাই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের সহিত জীবের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও সুখময় উপাসনা। জ্ঞানের দ্বারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

অবগত হইতে হইবে, কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে, ভক্তি ও প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে—ইহাই গীতার মতে শ্রেষ্ঠ যোগ, শ্রেষ্ঠ উপাসনা। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর এই যোগ বা উপাসনার প্রতিষ্ঠার জন্য গীতা উপনিষদের ভিত্তিতে পুরুষ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া নিজস্ব পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিকাশ করিয়াছে।

সাংখ্যের মতে শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা হইতেছে মুক্ত পুরুষ। সেখানে সংসার নাই, প্রকৃতি নাই, পুরুষ নিজের সনাতন, অক্ষর সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ। বেদান্তের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ সত্তা, সেখানে মায়ার খেলা নাই, জগৎ নাই। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই মতে পুরুষার্থ হইতেছে—এই শান্ত, নির্গুণ, অক্ষর অবস্থা লাভ করা, শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করা। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। তবে পুরুষের নীচের বদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত থাকে। বেদান্তের মতে প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মেরই একটা নীচের খেলা অথবা একটা মিথ্যা স্বপ্ন—উপরের অবস্থায় ইহা নাই। যোগের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের; ঈশ্বরই নিজের প্রকৃতিকে ধরিয়া সংসারলীলা করিতেছেন; মানুষকে সংসারলীলা ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে হইবে না; তবে ঈশ্বরের ন্যায়ই মুক্ত ও স্বাধীনভাবে সংসারলীলা করিতে হইবে—এইজন্য কর্ম্ম সাধনার অঙ্গও বটে এবং সিদ্ধির পরও কর্ম্ম থাকে। বেদান্তের মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে, উহা নীচের অবস্থা; কর্ম্মও নিম্নাধিকারীর পক্ষে উপাসনা। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ সত্তা হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য। গীতা উপনিষদের আলোকে এই সকল তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিয়াছে। এইরূপ সমন্বয়ের দ্বারাই গীতা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মিলিত পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৫

অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণের এক অজা বহু প্রজার উৎপাদিকা। এক অজ ইহাকে ধরিয়া ভোগ করিতেছে, আর এক অজ ইহাকে পূর্ণভাবে ভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বই এক অজা ও দুই অজের উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। ত্রিবর্ণের অজা হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্তা প্রকৃতি। প্রকৃতি চিরকালই আছে, ইহা সকল বিশ্ব-সৃষ্টির মূল, কিন্তু ইহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই—এই জন্যই ইহাকে অজা বলা হইয়াছে। পুরুষও অনাদি, অনন্ত, সনাতন সত্তা, অজ। এখানে দুইটি অজ দ্বারা পুরুষেব বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষ যখন প্রকৃতির খেলায় মগ্ন হয়, অজ্ঞানের বশে প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেলা মনে করিয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করে, তখন তাহার বদ্ধাবস্থা। গীতা বলিয়াছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

প্রথম অজটি পুরুষের এই বদ্ধ অবস্থার দৃষ্টান্ত। ভোগ সমাপনান্তে পুরুষ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতিতে অনাসক্ত হয়। তখন প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়, সংসারলীলা বন্ধ হয়, পুরুষ মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অজটি পুরুষের এই মুক্ত অবস্থার দৃষ্টান্ত। দুইটি অজ একই পুরুষের দুই অবস্থা—একটি বদ্ধ অবস্থা, অপরটি মুক্ত অবস্থা; একটি ভোগের অবস্থা আর একটি ত্যাগের অবস্থা; একটি সংসারের

অবস্থা, আর একটি স্বরূপ অবস্থা। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছে বলিয়াই প্রকৃতির সৃজনলীলা, বিশ্বলীলা চলিতেছে: পুরুষ ভোগ করিতে অস্বীকৃত হইলেই প্রকৃতির লীলা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন মনুষ্য মুক্ত হইলে, অন্য মনুষ্যগুলি মুক্ত হয় না; একজন পুরুষ জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতির খেলা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলে, প্রকৃতির সংসার-খেলা বন্ধ হয় না; সে-খেলার কোন ব্যতিক্রমই হইতে দেখা যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, সংসার যেমন চলিতেছিল ঠিক তেমনি চলিতে থাকে। ইহা কিরূপে সম্ভব? প্রচলিত সাংখ্য এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া। সংসারে বহু জীব, বহু পুরুষ। কোন পুরুষ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতেছে, তাহার পক্ষে প্রকৃতির লীলা, সংসার-লীলা বন্ধ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু অন্যান্য পুরুষেরা অজ্ঞানের বশে প্রকৃতির খেলাতে সায় দিতেছে, রস গ্রহণ করিতেছে; কাজেই বিশ্বলীলা অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে। সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বিশ্বলীলার যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে; সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞানও গীতা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু, গীতা বহুপুরুষবাদ স্বীকার করে না। গীতার সাংখ্য, বৈদান্তিক সাংখ্য। গীতার মতে পুরুষ বা ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্. এক ছাড়া আর দুই নাই। তাহা হইলে একই পুরুষ এক সময়ে মুক্ত ও বদ্ধ কেমন করিয়া হয়? একজন মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপাবস্থায় চলিয়া যাইলেই সমস্ত বিশ্বলীলা বন্ধ হইয়া যায় না কেন? গীতা বলিয়াছে, ভগবানের মধ্যে ইহা সম্ভব। একই সময়ে তিনি সংসার লীলায় মগ্ন বটেন, আবার সংসার লীলার অতীতও বটেন। উচ্চ স্তরে, উর্দ্ধের প্রতিষ্ঠায় তিনি সংসারলীলা হইতে মুক্ত; কিন্তু নীচের স্তরে সেই

সময়েই তিনি সংসারলীলায় মগ্ন। আবার উপরের শান্ত, মুক্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা হইতে তিনি নীচের সংসারলীলা অবলোকন করিতেছেন, সমস্ত লীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। গীতার এই মতের সমর্থন আমরা মুণ্ডকোপনিষদে পাই—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১,২

একবৃক্ষে দুই পক্ষী, এক সূত্রে আবদ্ধ চিরসখা। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে; অপরটি নিজে খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। একটি পক্ষী নিজের শক্তিহীনতা বশতঃ মুহ্যমান, শোকগ্রস্ত। কিন্তু প্রথম পক্ষীটি যখন অপরটিকে দেখিতেছে, এবং বুঝিতেছে যে, সকল মহিমা তাহারই, তখনই সে শোক হইতে মুক্ত হইতেছে। এখানে প্রথম পক্ষীটি হইতেছে প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ, বদ্ধ জীব; এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে চিরমুক্ত, শান্ত, অক্ষর পুরুষ—সমস্ত বিশ্ব তাহার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। প্রথমটি জীবাত্মা, দ্বিতীয়টি পরমাত্মা। জীব সংসার ভোগ করিতেছে, পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে ধরিয়া রাখিয়াছে, জীবের সংসারলীলা দেখিতেছে, কিন্তু নিজে রহিয়াছে চিরমুক্ত, বিশ্বলীলার অতীত। এই জীব পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে—পরমাত্মা ও জীব মূলতঃ একই বস্তু। পরমাত্মা জীবেরই উপরের সত্তা, প্রকৃতির খেলা হইতে মুক্ত হইলেই জীব সেই উপরের সত্তায় ফিরিয়া যাইতে পারে। জীব যখন জ্ঞানলাভ করে যে, পরমাত্মার যে মহিমা, যে দিব্য, মুক্ত, শান্ত, অক্ষরভাব, তাহা তাহার নিজেরই ভাব—তখনই

সে মুক্ত হয়। জীব সংসার-লীলায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, এবং যখন উপরে পরমাত্মার সন্ধান পাইতেছে, তখন সে সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পরমাত্মার শান্ত, শুদ্ধ, মুক্ত অবস্থা লাভ করিতেছে। এই শ্লোক দুইটির সহিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্লোকের তফাৎ এই যে, সেখানে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখানে মুক্ত পুরুষ (উপরের শাখার পক্ষী) কখনই প্রকৃতির খেলায় বদ্ধ হন নাই; তিনি চিরমুক্ত। কেবল তাঁহারই অংশরূপে বহু জীব নীচে নামিয়া সংসারলীলা ভোগ করিতেছে; আবার জ্ঞান লাভ করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এখানে দেখা যাইতেছে, একই পুরুষের একই সময়ে দুই অবস্থা—একটি উপরের একত্ব ও মুক্তির অবস্থা; আর একটি নীচের বহুত্ব ও বন্ধনের অবস্থা। উচ্চ অবস্থায় পুরুষ সকল সময়েই মুক্ত; নিম্ন অবস্থা হইতে কোন জীব মুক্তি লাভ করিয়া উপরের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। এই জন্যই সংসারে দেখা যায়—একই সময়ে কেহ বা মুক্ত, কেহ বা বদ্ধ। এই যে পুরুষের দ্বিধা ভাব, একই সময়ে দুই অবস্থা—ইহা হইতে পূর্ব্ব সমস্যার সমাধানের কতকটা পথ হইল বটে, কিন্তু এক কি করিয়া বহু হইল তাহা এখনও বুঝা গেল না।

আমরা দেখিলাম,—পুরুষের দুই অবস্থা, প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থা। একস্থানে বলা হইয়াছে, পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে; আর এক স্থানে বলা হইয়াছে, পুরুষ একই সময়ে মুক্ত রহিয়াছে, আবার প্রকৃতিকেও ভোগ করিতেছে। উপরের অবস্থায় মুক্তি, নীচের অবস্থায় ভোগ। গীতা উপনিষদের অন্যান্য অংশের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া এই দুইটির সহিত আর এক অবস্থার যোজনা করিয়াছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, পুরুষোত্তমের অবস্থা, এই বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহারই মহিমা। লীলার অবস্থা ক্ষর, আর মুক্তির

অবস্থা অক্ষর; কিন্তু, পুরুষোত্তমের মধ্যে এই তুইই একসঙ্গে স্থান পাইয়াছে—বিশ্বলীলা এবং সাক্ষীর অবস্থা এই তুইই পুরুষোত্তমের তুইটা দিক; কিন্তু তিনি এই তুইটারই উপরে। পুরুষোত্তম একই সময়ে অক্ষররূপে উদাসীন দ্রষ্টা; আবার ক্ষররূপে প্রকৃতিকে ধরিয়া লীলা করিতেছেন; পুরুষ একই, কিন্তু, প্রকৃতিকে ধরিয়া হইয়াছেন বহু। বহুত্ব বা ভেদ পুরুষে নাই, প্রকৃতিতে আছে। একই পুরুষ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীব হইয়াছেন, মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতাঃ। প্রত্যেক জীবই মূল সত্তায় এক অক্ষর, সনাতন পুরুষ; কিন্তু, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বভাব বা প্রকৃতিকে ধরিয়া হইয়াছে বহু।

পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতিই জীব হইয়াছে। এই প্রকৃতির বৈচিত্র্য-ময়ী লীলা—ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। প্রত্যেক জীবেই ভাগবত প্রকৃতির এক একটি অংশের বিকাশ হইতেছে; এবং সর্ব্বত্র সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া পুরুষোত্তমই প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাকে পরিচালনা করিতেছেন। পুরুষোত্তমের এই বিশ্ব-লীলা বন্ধনের লীলা নহে; তিনি ঈশ্বরভাবে প্রকৃতিকে পরিচালনা করিয়া লীলা করিতেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ৯।১০

উপনিষদের উদ্ধৃত অংশগুলিতে আমরা দেখিয়াছি—পুরুষের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় সংসারলীলা নাই; কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে—উচ্চতম অবস্থায় সংসার লীলা ভগবানের মুক্ত, দিব্য, স্বাধীন লীলা। মানুষই অজ্ঞানের বশে বদ্ধ হইয়া তুঃখময় সংসার ভোগ করে। মানুষই অহঙ্কারের বশে দেহ, মন, প্রাণকে, প্রকৃতির ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অংশকেই নিজের সবটুকু মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়।

তাই সে ভোগ করে দুঃখ ও অশান্তি। কিন্তু আমাদের স্বভাবের ভিতর দিয়া যে লীলার বিকাশ হইতেছে, তাহার ভোক্তা হইতেছেন আমাদের হৃদিস্থিত পুরুষোত্তম। আমরা মূল সত্তায় তাঁহারই সহিত এক; কেবল লীলার জন্য তাঁহার পরা প্রকৃতি আমাদিগকে নানারূপে সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পুরুষোত্তমকে আমাদের প্রিয়তম বলিয়া জানিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে আমাদের জীবনের, আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হইবে, আমরা পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিব। আমাদের ভিতরে থাকিবে অক্ষর পুরুষের অচল শান্তি, অনন্ত ঐক্য, অবিকল্প সাম্য; এবং বাহিবে আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিবে দিব্য স্বাধীন মুক্ত জীবনলীলা, দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য আনন্দের লীলা। ইহাকেই গীতায় বলা হইয়াছে, মম সাধর্ম্ম্য-মাগতাঃ, ময্যেব নিবসিষ্যসি ইত্যাদি।

এখন গীতার সমন্বয়টি আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদান্তের মতে বিশ্বলীলা মায়ার খেলা। এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া পর-ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিতে হইবে। সেখানে মায়া নাই, সংসার নাই। দেব, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই সব ব্রহ্মের নীচের অবস্থা। সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় ব্রহ্ম নির্গুণ। সাংখ্য বলিয়াছে, প্রকৃতি পুরুষকে অজ্ঞান করিয়া সংসারের খেলা উৎপন্ন করে। গীতা বলিয়াছে, এই মায়া বা অজ্ঞান নীচের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলা—ইহার স্বরূপ বাসনা ও অহঙ্কার। বাসনা ও অহঙ্কারের বশে মানুষ নিজ নিজ জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে না। কিন্তু, মায়াকে অতিক্রম করিতে হইবে, অহঙ্কার ও বাসনার নির্ব্বাণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই পরা প্রকৃতির খেলা ফুটিয়া উঠিবে—তাহাই দিব্য জীবন। গীতার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম, মুক্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে, লীলাময় পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম; এবং সাধনার দ্বারা সেই পুরুষোত্তমের

সহিত যুক্ত হওয়া, তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করা, তাঁহার সাহচর্য্যে দিব্য জীবনলীলা বিকাশ করা—ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি। অতএব আমরা দেখিতেছি, বেদ উপনিষদ দর্শনাদিতে প্রচলিত যে শিক্ষা তাহা অতিক্রম করিতে গীতা কুণ্ঠিত হয় নাই। বাস্তবিক, এই প্রথা অবলম্বন না করিলে গীতা তৎকাল-প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এরূপ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিত না। তবে গীতা যে পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিকাশ করিয়াছে তাহা অন্য কোথাও এই ভাবে পরিস্ফুট না হইলেও, উপনিষদে এখানে সেখানে আমরা ইহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। উপনিষদে নানা স্থানে বলা হইয়াছে, পরব্রহ্মের মধ্যে সগুণ ও নির্গুণ ভাব একই সঙ্গে রহিয়াছে, নির্গুণোগুণী। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, পুরুষঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ, যদিও অক্ষরই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহা অপেক্ষাও এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে।

গীতা উপনিষদ হইতে এই যে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে, ইহার পূর্ণ প্রভাব ভারতের পরবর্ত্তী ধর্ম্মজীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যে ভক্তির স্থান নাই। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে ছাড়াইয়া ভারতে যে মহান ভক্তিযোগের বিকাশ হইয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্বই ভক্তিপ্রধান পুরাণ সমূহের ভিত্তি। সংসারলীলা যদি মিথ্যা হয়, ব্রহ্মের সহিত জীবের যদি কোন ভেদ না থাকে, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? কিন্তু, পুরুষোত্তমের সহিত জীব মূলতঃ এক হইলেও প্রকৃতিতে বিভিন্ন। জীব পুরুষোত্তমের অংশ মাত্র, পরা প্রকৃতির এক একটি অংশ এক একটি জীবে প্রকট হইতেছে। সকল জীবের ভিতর দিয়া লীলা করিয়া প্রকৃতি পুরুষোত্তমেরই দিব্য ভোগ বিকাশ করিতেছে। পুরুষোত্তম আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, আমাদের ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বলীলা উপভোগ করিতেছেন। পিতা-

রূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রিয়তম প্রেমাস্পদরূপে আমরা যে সংসার লীলা করি —সকলের মধ্যে পুরুষোত্তমই আমাদের সেই লীলার আস্বাদ গ্রহণ করেন ; আমাদের সকল যজ্ঞকর্ম্মের ফল তিনি ভোগ করেন। আমরা যেদিন তাঁহার দিকে ফিরিব, তাঁহাকেই পিতা, মাতা, সখা, প্রিয়তম প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করিব, সেইদিনই আমরা জীবনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিব, আমাদের জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিবে। নিজেই নিজের প্রেম উপভোগ করিবার জন্য পুরুষোত্তম প্রকৃতিকে ধরিয়া অসংখ্য জীব হইয়াছেন -ইহাই প্রেম ভক্তির মূলতত্ত্ব।

গীতা যে মহান কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছে তাহারও ভিত্তি এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। অক্ষর পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হওয়া, নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়াই যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের কোন সার্থকতা নাই, জীবনেরই কোন অর্থ নাই। কর্ম্ম একটা বন্ধন, যত শীঘ্র ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ততই উত্তম। উপনিষদে আমরা এই কর্ম্মসন্ন্যাসের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখিতে পাই। এই জন্যই উপনিষদ বৈদিক যাগযজ্ঞাদিকে নিন্দা করিয়াছে। প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সাধককে কর্ম্ম বর্জ্জন করিতেই হইবে। উপনিষদ বলিয়াছে—দেবতারা মানুষের মুক্তির বিরোধী। মানুষ যেন দেবতাদের গরুবাছুরের মত। দেবতারা চান না যে মানুষ জ্ঞানলাভ করুক, মুক্ত হউক। ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না; তাঁহাকে লাভ করা যায় জ্ঞানের দ্বারা। উপরে যে দুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেখানে নীচের পক্ষীটি যখন উপরের পক্ষীটিকে দেখিতে পাইতেছে, নিজের আত্মস্বরূপ জানিতে পারিতেছে, তখন সে জ্ঞান লাভ করিয়াই মুক্ত হইতেছে। উপনিষদে সর্ব্বত্র আমরা এইরূপ জ্ঞানের প্রাধান্য দেখিতে পাই। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ

ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়াছেন জ্ঞানের জন্য নহে, কর্ম্মের জন্য—অর্জ্জুনকে মহান কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই গীতার শিক্ষার উদ্দেশ্য। গীতার শিক্ষা কোন জ্ঞানের সাধককে কথিত হয় নাই; কিন্তু একজন ক্ষত্রিয়কে কথিত হইয়াছে। গীতা দেখাইয়াছে. নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইবার এক প্রধান সহায় ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম। গীতা জ্ঞানকে ছোট করে নাই। গীতা বলিয়াছে, সকল কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানেই পৌছাইয়া দেয়,—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কিন্তু, গীতার মতে জ্ঞানলাভের পরও কর্ম্ম থাকে, তাহা হয় দিব্যকর্ম্ম। স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনে দিব্যকর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ৩।২২

প্রাচীন বৈদিক সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ ছিল না, কালক্রমে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বেদবাদিগণ ক্রিয়াবিশেষবহুল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকেই পুরুষার্থসাধক বলিয়া প্রচার করেন, অন্য পক্ষে ব্রহ্মবাদিগণ জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেন, এবং জ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের উপযোগিতা প্রচার করেন। উপনিষদের এই শিক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করায় প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়; যে সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস জীবনের শেষ পরিণতি বলিয়া গণ্য ছিল. তাহাই মুখ্য হইয়া গার্হস্থ্য আদর্শকে ক্ষুণ্ন করে। প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং শেষে সন্ন্যাসী। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণই মনুষ্য মাত্রের পরম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, যত শীঘ্র সম্ভব সন্ন্যাস গ্রহণই বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া উঠে, "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা" (জাবাল)। কিন্তু জ্ঞানলাভের পর

আর সংসারে কর্ম্ম করা যদি সম্ভব না হয়, জ্ঞানিগণকে যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়। প্রকৃত লোকহিতকর, সমাজহিতকর কার্য্য জ্ঞানীদের দ্বারাই সম্ভব, তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা যাহার হিতের জন্য করা হইয়াছে সেই সমাজেরই অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই জন্যই বোধ হয় মনু সন্ন্যাসাশ্রমের সীমা বৃদ্ধকালে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

"শরীরে বলি পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌত্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।" কিন্তু এই সমাধান মোটেই সন্তোষজনক নহে। যদি শেষ পর্য্যন্ত সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন না করিলে শ্রেষ্ঠ গতি ও পরম সিদ্ধিলাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শরীর মনের সমস্ত শক্তি বার্দ্ধক্যের বশে ক্ষীণ হইয়া আসা পর্য্যন্ত কি তাহার জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত? বস্তুতঃ মনুর এই ব্যবস্থা ব্যবহারে বজায় থাকে নাই। এ-বিষয়ে স্মৃতি অপেক্ষা গীতার সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। গীতা বলিয়াছে, পরমসিদ্ধি লাভের জন্য কখনই সন্ন্যাস আশ্রমে যাইবার আবশ্যকতা হয় না, সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে করিতেই মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গীতার এই মত নূতন নহে, প্রাচীন কালে এই কর্ম্মযোগের সাধনা প্রচলিত ছিল, তাহাই জনকাদির দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হইয়াছে। কালক্রমে সেই মহান যোগ নষ্ট হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন (৪।২।৩)। বেদ-সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে সন্ন্যাসাশ্রম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই। বরঞ্চ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ হয় এইরূপ বেদের বিধান থাকার কথা জৈমিনি বলিয়াছেন (বেদান্তসূত্র ৩-৪-১৭)।

মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞানলাভ করিয়া সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মত উপনিষদের যুগেই প্রথম প্রচারিত হয়।

গীতা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল সত্যটি গ্রহণ করিলেও তাহার বাহ্যিক রূপকে চিরন্তন বলিয়া স্বীকার করে নাই। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাসী এইরূপ আশ্রমের পর পর পৈঠার এই যে সোপান ইহাকেই "স্মার্ত্ত" অর্থাৎ স্মৃতিকারগণের প্রতিপাদিত মার্গ বলা হয়। কিন্তু গীতা স্মার্ত্তমার্গের গ্রন্থ নহে। বাহ্যিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে সনাতন অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে গীতা তাহারই সন্ধান দিয়াছে। চারি আশ্রম বিভাগের মূল তাৎপর্য্য ছিল এই যে, অধ্যাত্মজীবন লাভই মানবজীবনের পরম কাম্য. কিন্তু একেবারেই মানুষ সেই পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাই শিক্ষা ও সাংসারিক কর্ম্ম ও ভোগের ভিতর দিয়া দেহ, প্রাণ, মনকে ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে: কিন্তু প্রথম হইতেই অধ্যাত্ম-জীবনকে পরম লক্ষ্য বলিয়া জানিতে হইবে এবং সমস্ত জীবনকে সেই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। চারি আশ্রম বিভাগ কেবল এই নীতিটিকেই কার্য্যে পরিণত করিবার একটি তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্রমশঃ এই ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয় * এবং মানুষ সন্ন্যাসের মোহে সাংসারিক জীবনকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করে। তাই গীতা নিষ্কাম কর্ম্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল সত্যটি প্রচার করিয়াছিল। ভারতের পরম দুর্ভাগ্য, শঙ্করাদি সন্ন্যাসীগণের আগ্রহে এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের গতানুগতিকতায় গীতার এই প্রাণময় শিক্ষা আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

* কেহ কেহ বলেন যে এ ব্যবস্থা কখনই কার্য্যতঃ সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হয় নাই, ইহা কেবল একটি আদর্শ মাত্র ছিল।

উপনিষদের যে কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের ঝোঁক কালক্রমে শঙ্করের মায়াবাদে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাও সকল উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদগুলিকে তাহাদের কাল অনুযায়ী দুই ভাগ করিলে দেখা যায় যে, আগেকার উপনিষদগুলিতে বৈদিক যুগের কর্ম্মশিক্ষার প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; শেষের উপনিষদগুলিই ক্রমশঃ জ্ঞানের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়াছে। গীতা জ্ঞানকে সন্ন্যাসকে নিন্দা করে নাই, পরন্তু তাহাদের উচ্চ সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। বাহ্য সন্ন্যাস নহে, চাই ভিতরের ত্যাগ। ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ। কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না, জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন-দোষ বিনষ্ট করিয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। গীতায় কর্ম্মের উপর পুনঃ পুনঃ যে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, তাহার বীজ আমরা ঈশোপনিষদে দেখিতে পাই—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

"বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে এই সবই ভগবানের বাসের জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না। এই সংসারে কর্ম্ম করিয়াই একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে। তোমার পক্ষে ইহাই সত্য, অন্য কিছু নহে; কর্ম্ম মনুষ্যকে বদ্ধ করে না।"

সাংখ্য ও গীতা

গীতা কঠিন দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সূক্ষ্ম আলোচনার গ্রন্থ নহে, এবং কেবল দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তিব উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করিতে যাইলে আমরা গীতা পাঠের ঠিক ফল লাভ করিতে পারি না। গীতা মূলতঃ যোগশাস্ত্র, অর্থাৎ মানুষ যে ভাবে চলিলে নিজের সত্তার ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য আনন্দ লাভ করিতে পারে, এক কথায় দিব্যজীবনের অধিকারী হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারে, গীতায় তাহারই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। গীতা নিজস্ব যোগ-প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত যে-সকল দার্শনিক তত্ত্বের ও দার্শনিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ কবিয়াছে, তাহা ভারতের তৎকাল-প্রচলিত দর্শনসমূহ হইতেই গৃহীত। ভারতের সেই দর্শন আর নাই, তাহার মর্ম্মার্থ ঠিকভাবে গ্রহণ করাও এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব, গীতা-কথিত দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদসমূহের পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক (Academic) সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া এখন আর বিশেষ কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু দর্শন চর্চ্চার জন্য গীতা পাঠ করিতে না গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের নিমিত্ত, মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধনের নিমিত্ত গীতার মধ্যে যে অপূর্ব্ব উপদেশরাজি সমুদ্রের মাঝে অসংখ্য রত্নের ন্যায় নিহিত রহিয়াছে তাহাই যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করিলেই তাহা সার্থক হইতে পারে। তবে যুগধর্ম্মের প্রভাবে তর্কবুদ্ধির উপরই আমরা এতটা নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছি, যে

আমাদের জিজ্ঞাসা-প্রবণ মনকে কতকটা শান্ত করিতে না পারিলে কার্য্যতঃ যোগের পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন হয়। ভারতীয় ষড়দর্শনের মূলতত্ত্বগুলির সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা অনেক স্থলে ঐ সকল তত্ত্বের সহিত গীতার অসামঞ্জস্য দেখিয়া বিষম সংশয়ে পতিত হইয়া থাকেন। অতএব প্রচলিত দর্শনসমূহের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ, গীতা তাহাদের কতখানি গ্রহণ করিয়াছে, কতটুকু বর্জ্জন করিয়াছে, যতখানি গ্রহণ করিয়াছে তাহারও মধ্যে কি পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাতে কতটুকু যোগ করিয়াছে, মোটামুটি যতদূর সম্ভব তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা প্রয়োজন। নতুবা গীতা যেখানে সাংখ্যের কথা বলিয়াছে বা যোগের কথা বলিয়াছে, সেখানে যদি আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকারিকার সাংখ্য-মত বুঝি বা পতঞ্জলির যোগদর্শন বুঝি, তাহা হইলে গীতা-শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। বেদান্ত-জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনখানি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু সেইজন্য যদি আমরা শঙ্করের মায়াবাদের আলোকে গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে গীতার প্রধান কথাগুলিই আমরা ধরিতে পারিব না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সাংখ্যের সহিত গীতার ঠিক কি সম্বন্ধ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ, এবং বরাবর ইহার অনেকটা মত ও পদ্ধতি সাংখ্যেরই অনুরূপ। তথাপি গীতা সাংখ্যকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং সাংখ্যের নিম্নস্তরের বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে। কার্য্যতঃ সাংখ্যের সহিত গীতার যে পার্থক্য হইয়াছে, প্রথমেই সেগুলি সংক্ষেপে বলা যাইতে

পারে। সাংখ্যমতে সংসার দুঃখময়—এই দুঃখের চরম নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। সংসারে থাকিয়া নানা উপায়ে এই দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে হইলে সংসারের খেলা বন্ধ করিতে হইবে; যে-সকল বন্ধন আমাদিগকে সাংসারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া রাখে সে সব ছিন্ন করিতে হইবে; এক কথায়, সংসারের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, দুঃখময় সংসারকেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। রোগীকে নাশ করিয়া রোগ উপশমের এই ব্যবস্থা গীতার অনুমোদিত নহে। এই বিশ্ব-লীলাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্যই যে আমরা এই লীলার মধ্যে আসিয়াছি, গীতা বিশ্ব-লীলাকে এরূপ নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করে না। তবে মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন করে তাহা সাংখ্যের বর্ণনানুযায়ী দুঃখময় বটে; সে জীবন ছাড়াইয়া আমাদিগকে উপরে উঠিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্য জীবনলীলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষের মধ্যেই দিব্যসত্তা, দিব্যশক্তি রহিয়াছে, সাধনার দ্বারা মানুষ নিজের দিব্যভাব বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, এই দুঃখ-দ্বন্দ্বময় জীবনের উপরে উঠিয়া দিব্য আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারে, বিশ্ব-প্রকৃতির লীলার মধ্যে থাকিয়া, ইহলোকে এই মর্ত্যধামে থাকিয়াই অফুরন্ত অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে,—সুখমক্ষয়মশ্নুতে। সাংখ্য পুরুষার্থ লাভের পথ দেখাইয়াছে—জ্ঞান, কর্ম্মসন্ন্যাস; সাংখ্যের সাধনায় কর্ম্মের কোন স্থান নাই। গীতার মতে কর্ম্ম সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। সাংখ্যের সাধনায় ঈশ্বরে ভক্তির কোন স্থান নাই, ঈশ্বরই নাই। গীতার মতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু; বিশ্বসংসারে যাহা কিছু সব সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর হইতেই আসিয়াছে; সেই ঈশ্বরে আত্ম-

সমর্পণ ও ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। সাংখ্যের মতে মুক্তির পর সংসার নাই, জীবন লীলা নাই, পুরুষ তখন নিজের শান্ত নিষ্ক্রিয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। গীতার মতে মুক্তির অর্থ ভগবানের সহিত মিলন, ভগবানের মধ্যে বাস, ময্যেব নিবসিষ্যসি, আত্মায় ভগবানের সহিত ঐক্যলাভ, প্রকৃতিতে দিব্যভাব। ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদন, সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং ভগবানকে দেখিয়া, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্—এই জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে প্রেম, সর্ব্বভূতের হিতসাধন, ইহাই পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিয়াও গীতা কেমন করিয়া এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, এইবারে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই বিভিন্ন সত্তা। এই বিশ্ব-সংসারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা কিছু হইতেছে, সবই পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধের ফল। বহির্জগতে বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি মূল ভূতসমূহ, এবং তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া যে-সকল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ব্যাপার চলিতেছে, এবং অন্তর্জগতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, সঙ্কল্প বিকল্প প্রভৃতি যে সব মনের ও প্রাণের ব্যাপার চলিতেছে—সে সবই প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রাকৃত জগতে নিম্নতন অচেতন জড় পদার্থ হইতে ক্রমবিকাশের ফলে যে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী, শেষে মানব মন ও বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, এ সবই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের পরস্পর মিশ্রণ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। কিন্তু, প্রকৃতি একা নড়িতেই পারে না; পুরুষ যদি তাহার কাজ না দেখে, যদি না অনুমতি দেয় তাহা হইলে প্রকৃতির কোন কাজই চলে না। পুরুষকে দেখাইবার জন্য, ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া—নতুবা তাহার কার্য্যের কোন প্রেরণা নাই। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব

করে; কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের অনুমতির অপেক্ষা করে। পুরুষ অনুমতি না দিলেই সংসার খেলা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু প্রকৃতির খেলাতে পুরুষ এমনই আসক্ত হইয়া পড়ে যে, পুরুষ নিজের স্বতন্ত্র সত্তার কথা ভুলিয়া যায়, আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে; তাই জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সেই খেলা চলিতে থাকে। যখনই পুরুষ নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে, প্রকৃতির খেলার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে না চায়, তখনই প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়। মোহিনী রমণী যেমন প্রণয়ীকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্তই নানা রূপে নিজের হাবভাব বিস্তার করে, পুরুষ তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলে তাহার যেমন ছলনা বিস্তার করিবার আর কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ এই বিশ্বজগতে পুরুষ যতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে ততক্ষণই সে খেলা চলিতে থাকে। প্রকৃতির খেলায় পুরুষ কার্য্যতঃ কোনরূপে যোগদান করে না; পুরুষ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ চৈতন্যময়। তথাপি প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় তাহার চৈতন্য এরূপ সমাচ্ছন্ন হয় যে তাহাতেই পুরুষের ভ্রম হয় বুঝি ঐ সমস্ত ক্রিয়া তাহারই নিজের। শুভ্র স্ফটিকের পার্শ্বে জবাফুল রাখিলে ঐ স্ফটিক যেমন দৃশ্যতঃ রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু বস্তুতঃ সে শুভ্রই থাকে, তাহার মূল সত্তার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, জবাফুল সরিয়া গেলেই সে তাহার আদিম শুভ্র সত্তা আপনা হইতেই ফিরিয়া পায়; তেমনিই প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষ সংসারলীলায় বদ্ধ হয়, সুখ-দুঃখ ভোগ করে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার কোন বন্ধন নাই, কোন ভোগ নাই; সে নিত্য, শান্ত, অচল, অক্ষর, চৈতন্যময়। পুরুষ যখন এই সাংখ্যোক্ত জ্ঞান লাভ করে, প্রকৃতিকে নিজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে, সে যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন প্রকৃতির খেলা হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়, সংসার-

খেলা বন্ধ হইয়া যায়, সংসারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রকৃতির এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন প্রকৃতির কোন ক্রিয়া নাই, সংসারলীলা নাই; প্রকৃতি তখন অব্যক্ত। পুরুষের সান্নিধ্যে আসিলে গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব হইতেই সংসারের খেলা ফুটিয়া উঠে, পুরুষ এই গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়। জ্ঞানলাভের ফলে পুরুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই তিন গুণের খেলা তাহার নহে—প্রকৃতির, তখন গুণগুলি আবার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, পুরুষ মুক্তি পায়।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানই গীতার যোগের ভিত্তি। প্রকৃতিকে পুরুষ বা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা, তিন গুণের খেলাকে বাহিরের খেলা বলিয়া উপলব্ধি করা, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, আমার ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু ঘটিতেছে—নৈসর্গিক ঘটনাপুঞ্জ, আমার অন্তরের সুখ-দুঃখ, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, দ্বেষ—তাহা আমার নহে—প্রকৃতির, আমি বস্তুতঃ নিত্য, সনাতন, অচল, অক্ষর আত্মা, প্রকৃতির অনিত্য খেলা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সাংখ্যের এই ভাবের উপলব্ধি গীতার মতে যোগের প্রথম সোপান। গীতার প্রথম অংশেই অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। কিন্তু গীতা এখানেই থামে নাই; এখানে থামিলে গীতোক্ত সাধনায় কর্ম্ম ও ভক্তির কোন স্থানই হইত না, ত্রিগুণের খেলার উপরে দিব্য জীবনলীলার সন্ধান গীতা দিতে পারিত না।

সাংখ্যের মতে পুরুষের দুই অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী ক্রিয়াতে পুরুষ যখন নিমগ্ন, পুরুষ যতক্ষণ আসক্তি ও অহঙ্কারের বশে দেখে এ-খেলা তাহারই নিজের, ততক্ষণ সে সংসারের বদ্ধ জীব, অনিত্য সংসারের সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বে পড়িয়া সে অশান্তি ভোগ

করে। পুরুষ যখন জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষ তাহার শান্ত, নীরব, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। গীতা এই দুই অবস্থাব উপরে আর এক অবস্থাব সন্ধান দিয়াছে। সেখানে পুরুষ প্রকৃতির ঈশ্বর,—স্বাধীনভাবে ও সজ্ঞানে প্রকৃতিকে ধরিয়া লীলা করিতেছে। সাংখ্যের পুরুষের বদ্ধ অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে ক্ষর, সাংখ্যের পুরুষের মুক্ত অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে অক্ষর। আর এই ক্ষর ও অক্ষরের উপরে যে অবস্থা তাহাকে গীতা বলিয়াছে পুরুষোত্তম।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

১৫।১৬, ১৭, ১৮

সাংখ্যের মতে কূটস্থ বা অক্ষর অবস্থা লাভই নিঃশ্রেয়স। ইহার উপরে আর কিছুই নাই। গীতা বলিয়াছে, আত্মার ঊর্দ্ধগতিতে কূটস্থ অবস্থা লাভ একটি সোপান মাত্র, পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই তাহার চরম সিদ্ধি। এই পুরুষোত্তম কি? পুরুষ হইতেছে ভগবানেরই নিজের সত্তা—তিনটি স্তরে বা চেতনার ক্ষেত্রে তিন প্রকার সত্তা—ক্ষর, অক্ষর, উত্তম। ক্ষর পুরুষ হইতেছে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে পুরুষ বাঁধা পড়িয়াছে,—ভোক্তা, ভর্ত্তা প্রভৃতি হইয়া অনিত্যের আনন্দ গ্রহণ করিতেছে। অক্ষর পুরুষ হইতেছে প্রকৃতির উপরে,—প্রকৃতি হইতে মুক্ত, বিযুক্ত যে পুরুষ। তিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। আর

পুরুষোত্তম হইতেছে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ যাহাতে যুগপৎ স্থান পাইয়াছে। পুরুষোত্তমের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠারূপে রহিয়াছে যে অচল শান্তি, যে অনন্ত ঐক্য, যে অবিকল্প সাম্য, তাহাই অক্ষর পুরুষ ; আর প্রকাশের জন্য, লীলার জন্য যখন তিনি প্রকৃতিকে ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে চলিয়াছেন, তখন প্রকৃতির মধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ক্ষর রূপ।

জীবেরও আছে এই তিন অবস্থা,—কারণ জীব ভগবানেরই অংশ, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপায়ণ। জীব যখন অজ্ঞানের খেলায় মগ্ন, প্রকৃতির দ্বারা অবশ হইয়া চলিতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তাহার ক্ষরের অবস্থা—ইহাই সাধারণ মানুষের অবস্থা, সাংখ্যের বদ্ধ পুরুষের অবস্থা। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির খেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার নিষ্কম্প, অচল, শান্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার অক্ষরের অবস্থা—ইহাই সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের অবস্থা, বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণের অবস্থা, মায়াবাদীদের নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থা। আর যখন জীবের ভিতরে থাকে ভগবানের অনন্ত সত্তার সহিত ঐক্য, অটুট শান্তি, অবিকল্প সাম্য, আর বাহিরে প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যরূপ, প্রকৃতি সজ্ঞানে ভগবানের হস্তের যন্ত্র হইয়া, নিমিত্ত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলে—তখনই হয় তাহার পুরুষোত্তমের অবস্থা, মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।

সাংখ্য বলে, পুরুষ যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই প্রকৃতি তাহাকে লীলা দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। পুরুষ যদি জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে প্রকৃতির এই মোহিনী লীলা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। পুরুষের যদি বাসনা না থাকে, অহঙ্কার না থাকে, আসক্তি না থাকে—তাহা হইলে প্রকৃতি আর তাহাকে বন্দী করিতে পারে না। অতএব প্রকৃতির লীলার প্রবৃত্তি ফুরাইয়া যায়। গীতা বলে, পুরুষকে আসক্তিতে

বদ্ধ করিয়া অবশ ভাবে সংসার ভোগ করানই প্রকৃতির একমাত্র খেলা নহে; ইহা কেবল প্রকৃতির অজ্ঞানের খেলা, অবিদ্যা-মায়ার খেলা। ইহা ছাড়াও প্রকৃতির এক সজ্ঞান খেলা আছে,—মুক্ত পুরুষের বশীভূত হইয়া পুরুষের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ অনুসারেও প্রকৃতি লীলা করিয়া থাকে; এবং কেবল তখনই হয় তাহার দিব্য-রূপের, দিব্য-লীলার বিকাশ, বিদ্যামায়ার খেলা। মানুষ যতক্ষণ বাসনা, আসক্তি, অহঙ্কারের বশে কর্ম্ম করে ততক্ষণ সে প্রকৃতির অধীন জীবন যাপন করিয়া সংসারের অনিত্যম্ অসুখম্ খেলায় নিমগ্ন থাকে। বাসনা ও অহঙ্কারকে জয় করিয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রকৃতিকে বশ করিয়া যখন মানুষ জীবন-লীলা করে তখনই সে-জীবন হয় দিব্য-জীবন, ভাগবত জীবন।

তাহা হইলে সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এক; গীতার মতে প্রকৃতি দুই অথবা একই প্রকৃতির দুই রূপ, বিকৃত রূপ ও স্বরূপ, অপরা ও পরা। সাংখ্যের মতে প্রকৃতির খেলা বন্ধ করিয়া সংসারের পারে যাইতে হইবে,—গীতার মতে অপরা প্রকৃতির খেলা ছাড়িয়া, পরা প্রকৃতির খেলা বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে! আরম্ভে সাংখ্য ও গীতায় কোন তফাৎ নাই। সাংখ্যের যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, তাহাই গীতার অপরা প্রকৃতি; সাংখ্যের ন্যায়ই গীতাও বলিয়াছে যে, এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাইবার নিমিত্ত সাংখ্য যে জ্ঞান ও অভ্যাসের পথ দেখাইয়াছে, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। তবে নীচের এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াইয়া উর্দ্ধে পরা প্রকৃতির দিব্য জীবন লাভ করিতে হইলে সাংখ্যের কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগেরই প্রশংসা করিয়াছে,

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ৫।২

সাংখ্যের মতে পুরুষের মুক্ত অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, সাধনার অবস্থাতেও কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগের মার্গই অবলম্বনীয়। গীতা কিন্তু বুঝিয়াছে যে, কর্ম্মত্যাগ অত সহজ ব্যাপার নহে; বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি যে কর্ম্মপ্রবাহ চালাইয়াছে তাহা বন্ধ করা অসম্ভব। কর্ম্ম যখন চলিবেই,—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ,—তখন কর্ম্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কি ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, পরন্তু সে-কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ গীতা দিয়াছে; এবং ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে, এই কর্ম্মযোগের সঙ্গে মূলতঃ সাংখ্যের কোন বিরোধই নাই। প্রকৃতিই যখন সব করিতেছে, পুরুষ কিছুই করিতেছে না—তখন কর্ম্ম করা বা না করা পুরুষের পক্ষে দুই-ই সমান। পুরুষ যখন এই জ্ঞান লাভ করে, সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতির উপর আরোপ করে, তখনই হয় প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস। গীতার মতে ভিতরের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ সম্ভবও নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। যে ব্যক্তি ভিতরে আসক্তি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে, সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিতে আরোপ করিয়াছে, কোন কর্ম্মই তাহাকে আর বদ্ধ করিতে পারে না, ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।১০

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্ম্মের প্রয়োজন কি? আসক্তি ও বাসনার বশে কর্ম্ম করিলে যদি তাহা বন্ধনের কারণ হয়, এবং অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করা কঠিন, তখন নিতান্ত যতটুকু না করিলে নয় কেবল ততটুকু কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে সম্পাদন করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম হইতে দূরে থাকাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নহে? কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ

যুদ্ধে রত হইয়া সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিয়া আত্মার কি কল্যাণ সাধিত হইবে? সাংখ্যের এই নৈষ্কর্ম্ম্যের ঝোঁককে কাটাইয়া গীতা পুনঃ পুনঃ কেন সকল প্রকারের কর্ম্ম, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, করিবার উপদেশ দিয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গীতার ভাব এই—সাংখ্য বলিতেছে প্রকৃতিই সব করে, পুরুষ কিছুই করে না। তাহাই যদি হইল, তবে মানুষ যে কর্ম্মই করুক না কেন, প্রকৃতিই সব করিতেছে এই ভাব ভিতরে থাকিলেই ত সাংখ্য মতের কোন প্রত্যবায় করা হয় না। অথচ, গীতার যে লক্ষ্য তাহা সাংখ্য হইতে বিভিন্ন, গীতা সাংখ্যের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সের উপরে উঠিতে চায়; এবং তাহার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন,—কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। এই কর্ম্মের প্রয়োজনের উপর গীতা কেন এত ঝোঁক দিয়াছে তাহা বুঝা প্রয়োজন। সাংখ্যের উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাওয়া, জীবন লীলা বন্ধ করা। গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে শুদ্ধ, রূপান্তরিত করিয়া উপরের প্রকৃতির দিব্য খেলা বিকাশ করিয়া তোলা। নীচের প্রকৃতির অশুদ্ধি দূর করিবার নিমিত্তই যোগীরা অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

নীচের প্রকৃতির অশুদ্ধি দূর করিতে পারিলে, অজ্ঞান অহঙ্কার বাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে আমরা দিব্যজীবন লাভ করিব আমাদের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। এই দিব্য প্রকৃতিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, স্বভাব, স্বধর্ম্ম। আমরা যতক্ষণ নীচের প্রকৃতিতে আছি, ততক্ষণ আমরা স্বরূপ হারাইয়া বিকৃত জীবন যাপন করিতেছি, জরামৃত্যুদুঃখময় সংসারে পড়িয়া অমৃতে বঞ্চিত হইয়া আছি। নির্ম্মমভাবে এই নীচের খেলা বর্জ্জন করিয়া আত্মার

প্রকৃত স্বরূপে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহার জন্য চাই জ্ঞান, চাই কর্ম্ম, চাই ভক্তি। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে দিব্যজীবন লাভের যে সাধনা তাহাই গীতার পূর্ণযোগ। ইহার মধ্যে সাংখ্যের জ্ঞান ও সন্ন্যাসের স্থান আছে; কিন্তু গীতার সমন্বয় যোগের অঙ্গ হইয়া সে জ্ঞান ও সন্ন্যাস আরও উদার, গভীর ও মহান অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির খেলার উপরে আমাদের আত্মা রহিয়াছে। এই নীচের দ্বন্দ্বময় ত্রিগুণের খেলাই আমাদের জীবনের সব নহে। বুঝিতে হইবে, বিশ্ব জগতের যাহা কিছু সবই ভগবান হইতে আসিয়াছে, সবই ভগবান—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। অমরা ভগবানেবই অংশ। আমাদের আত্মসত্তায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করা, আমাদের প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার নিখুঁত যন্ত্র হওয়া ইহাই নিঃশ্রেয়স, ইহাই নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্তি, ইহাই নীচের অহঙ্কারের নির্ব্বাণ। কিন্তু এই জ্ঞান একটা মানসিক ধারণা মাত্র নহে, বিচার বিতর্কের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। শুদ্ধ আধারে ভিতর হইতে যে আলোক স্বতঃ প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। এই শুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য চাই কর্ম্ম, চাই ভক্তি। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই যখন সব করিতেছে, পুরুষের যখন কোন কৃতিত্ব, কোনই দায়িত্ব নাই, তখন কি কর্ম্ম হইল না হইল, কিরূপভাবে কর্ম্ম হইল তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। গীতা কিন্তু কর্ম্মের সার্থকতা দেখাইয়াছে; কর্ম্মের দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, নীচের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। অতএব যেমন তেমন ভাবে কর্ম্ম করিলে চলিবে না। আমরা সাধারণতঃ বাসনার বশে, অহঙ্কারের বশে যে-সব কর্ম্ম করি, তাহা আমাদিগকে নীচের জীবনে, অপরা-প্রকৃতির মধ্যে বাঁধিয়া রাখে। অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রথমে সমস্ত কর্ম্মফল,

ক্রমে সমস্ত কর্ম্ম পর্য্যন্ত ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার যন্ত্রভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগ। এইরূপ নিষ্কাম ঈশ্বরার্থে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। আবার জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম আরও নিষ্কাম হয়, অনাসক্ত হয়। জ্ঞান কর্ম্মকে শুদ্ধ করে, কর্ম্ম জ্ঞানকে পূর্ণ-করে। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা ক্রমশঃ দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হই।

কিন্তু এই জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলে থাকে ভক্তি এবং ইহাদের চরম পরিণতি ভগবানের সহিত ঐকান্তিক মিলন। কেবল অক্ষরের শান্ত কূটস্থ অবস্থায় উপনীত হওয়াই গীতার লক্ষ্য নহে। পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করিতে হইবে, ময্যেব নিবসিষ্যসি, পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিতে হইবে; জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে পুরুষোত্তমের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের সমস্ত আধারকে, সমস্ত জ্ঞান কর্ম্মকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে, ভগবানকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া, মামাশ্রিত্য, আমাদিগকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হইবে; এবং এইরূপেই অমরা দ্রুত নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারিব।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২ ৬, ৭

সাংখ্যের লক্ষ্য ছিল দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির সন্ধান পাইয়াই সাংখ্য থামিয়া গিয়াছে। এই নিবৃত্তি সাধনের নিমিত্ত যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিক কিছুর সন্ধান সাংখ্য করিতে চায় নাই। সকল তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা হইল না, দুঃখ-নিবৃত্তির উপরেও আরও কিছু আছে কিনা তাহা দেখা হইল না, সাংখ্য সে সব

লইয়া আর ব্যস্ত হয় নাই। তাই সাংখ্যে আছে গভীর বিশ্লেষণ, কিন্তু সমন্বয় নাই। সাংখ্যে দেখান আছে মুক্তির পথ, কিন্তু তাহা শ্রেষ্ঠ রহস্যে লইয়া যায় না। গীতা সাংখ্যের এই অপূর্ণতাকে বৈদান্তিক জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ করিয়াছে। সাংখ্য বিশ্বতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষর পুরুষ পর্য্যন্ত গিয়াই থামিয়া গিয়াছে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে যে অবিকল্প শান্তি, ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি লাভ করা যায়, তাহার সন্ধান পাইয়াই সাংখ্য সন্তুষ্ট হইয়াছে; এবং কি করিলে সেই অক্ষরের শান্তি, কৈবল্য লাভ করা যায় তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রকৃতি এক, পুরুষও যদি এক হয় তাহা হইলে সকলেই কেন সমানভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে না, একজন মুক্ত হইলে সকলে কেন মুক্ত হয় না—ইহার কোন ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না দেখিয়া সাংখ্য বলিয়াছে, প্রকৃতি এক কিন্তু পুরুষ বহু। কিন্তু এই বহু পুরুষ ও প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল—সাংখ্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে নাই। পুরুষ নিজে শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত—প্রকৃতির সম্পর্কে আসিলেই তাহার সংসার-ভোগের অনিত্য অসুখময় খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি দুই বিভিন্ন সত্তা—ইহারা উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে কেমন করিয়া আইসে? সাংখ্য এইখানে ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিত, বলিতে পারিত—এই প্রকৃতি ও এই সকল পুরুষ এক পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হয়। কিন্তু সাংখ্য তাহার কৈবল্য-সাধনায় এরূপ ঈশ্বর-তত্ত্বের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। সাংখ্য বলিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, চিরকাল রহিয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ অদৃষ্টের বশে হয়, অর্থাৎ কি করিয়া হয় তাহা জানা যায় নাই, তাহা "অদৃষ্ট," unknown. পুরুষ যখন জ্ঞানলাভ করে তখনই সে মুক্ত হইয়া যায়,

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার এই মুক্তিলাভে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সাংখ্য এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু গীতা এই সকল তত্ত্বকে গুছাইয়া বৈদান্তিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্য প্রকৃতির যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছে, গীতার মতে ত্রিগুণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্য কার্য্যাবলী সেইরূপই বটে। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে, তাহাও ঠিক এবং বন্ধন, মুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্য্যতঃ এই সাংখ্য-জ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা শুধু নীচের অপরা প্রকৃতি। তাহা ত্রিগুণময়ী, অচেতন। ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে—তাহা পরা, চেতন, দিব্য প্রকৃতি এবং সেই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) হইয়াছে। নীচের প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহংভাবে প্রতিভাত, উপরের প্রকৃতিতে তিনি একমাত্র পুরুষ। সাংখ্যের মতে বহু পুরুষই বহু জীব ; গীতার মতে বহু জীব সেই এক পরম পুরুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বহু রূপে আত্ম-প্রকাশ। যে-শক্তি সহায়ে ভগবান বহু রূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির মত স্বতন্ত্র নহে। ইহা ভগবানেরই বিশ্বলীলার শক্তি। প্রকৃতি যে কেবল পুরুষের অনুমতি ও দৃষ্টি পাইলেই কাজ করে তাহা নহে, প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হয়—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির এই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ইহা উপরের সম্বন্ধ ; বহু জীব রূপে ভগবান যখন সংসারের অনিত্য লীলা উপ-ভোগ করেন তখন তিনি অবশ ভাবে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হন ;

ইহাই অপরা প্রকৃতির খেলা, অজ্ঞানের খেলা। কিন্তু এই বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা, এই পরা ও অপরার খেলা—এ-সবই যুগপৎ এক ভগবানের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে; এবং ইহা পরম রহস্যময়—পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। যিনি জীবরূপে অপরা প্রকৃতির খেলায় বদ্ধ, তিনি ঈশ্বররূপে পরা প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। আবার তিনিই পরা ও অপরা সকল খেলার উপরে। একাধারে যুগপৎ এসব কেমন করিয়া সম্ভব হয়, আমাদের মানসিক বুদ্ধিতে তাহা ধারণা করা যায় না। গীতার ভগবান anthropomorphic বা মানুষের তুলনায় কল্পিত নহে, তবে মানুষকে যাহা হইতে হইবে তিনি তাহার আদর্শ। * যাঁহারা ভগবানে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া যোগ সাধনা করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে অসংশয়ে জানিতে পারেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ৭।১

জীব যখন অজ্ঞান তখন সে প্রকৃতির অধীন; আসক্তি, বাসনা

* ভগবান তাঁহার পরম পদে সকল অভিব্যক্তির উর্দ্ধে, অচিন্ত্য, অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, কিন্তু তিনি তাঁহার সেই পরম পদেই সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপে নিজেকে জগতে প্রকট করিয়াছেন, তিনিই ক্ষররূপে এই জগৎ ও সর্ব্বভূত হইয়াছেন, তিনিই অক্ষররূপে এই জগতের প্রতিষ্ঠাভূমি হইয়াছেন, সকল জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে বিরাজিত থাকিয়া তিনিই তাহাদিগকে তাহাদের পরম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিতেছেন; জীব যাহাতে তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে তাহার পন্থা দেখাইবার জন্য, তাঁহার জীবন্ত আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিবার জন্য, তাঁহার প্রেম ও মাধুর্য্যের দ্বারা সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে মানবদেহে অবতীর্ণ হইতেছেন। অবতার রূপে তাঁহার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের রহস্য যাহারা জানিতে পারে তাহারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দিব্য জীবন লাভ করে (গীতা ৪।৯)।

ও অহঙ্কারের দ্বারা অবশ করিয়া প্রকৃতি জীবকে পরিচালিত করে, এবং সংসারে ভগবানের গূঢ় ইচ্ছা সম্পাদন করে। এই প্রকৃতি স্বাধীন নহে। ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র, ভগবানের দ্বারাই পরিচালিত। অজ্ঞানের বশে জীব ভাবে সে বুঝি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামত যাহা কিছু করিতেছে—কিন্তু, বস্তুতঃ ভগবানই প্রকৃতির দ্বারা তাহাকে চালিত করিতেছেন, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। এই যে ভগবান আমাদের হৃদ্দেশে গুপ্তভাবে থাকিয়া সকল সময়ে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, যখন অবিদ্যার আবরণ ছিন্ন করিয়া এই ভগবানের সহিত আমরা যুক্ত হই তখনই হয় আমাদের দিব্যজীবন, তখন আত্মসত্তায় আমরা ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমাদের প্রকৃতির দিব্য স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, আমাদের প্রকৃতি তখন হয় দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত, দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ, ভগবানের ইচ্ছাপূরণের দিব্য যন্ত্র। এই দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে না, জীবন-লীলা বর্জ্জন করিতে হইবে না, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও আমরা সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি যদি আমরা ভগবানের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারি—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা যে তিন পুরুষ ও দুই প্রকৃতির তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছে, ইহাই গীতার প্রধান কথা এবং গীতার দিব্যজীবন ও দিব্যকর্ম্মের সমগ্র শিক্ষাটি ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটি ধরিতে না পারিলে গীতা-শিক্ষার নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় না, গীতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায় না। অথচ গীতার বিখ্যাত

ভাষ্যকারগণ এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব লইয়া বিশেষ গোলমাল বাধাইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ক্ষরশ্চ ক্ষরতি ইতি ক্ষরঃ বিনাশী একো রাশিরপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্‌বিপরীতঃ ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্য উৎপত্তিবীজম্. অর্থাৎ, যাহা ক্ষরিত হয় বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহাই হইতেছে ক্ষরপুরুষ, আর অক্ষর হইতেছে এই ক্ষর হইতে বিপরীত পুরুষ, ইহাই ভগবানের মায়াশক্তি এবং এই অক্ষরই ক্ষর-নামক পুরুষের উৎপত্তির বীজস্থানীয় কারণ। লোকমান্য তিলক তাঁহার গীতা-রহস্যে মূলতঃ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষর ও অক্ষর শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত সৃষ্টি ও অব্যক্ত প্রকৃতি এই শব্দেরই সহিত সমানার্থক। অর্থাৎ গীতা যে ক্ষর ও অক্ষরকে স্পষ্ট পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, শঙ্কর ও তিলক তাহাদিগকে প্রকৃতি বলিয়াই বুঝিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতা বলিয়াছে, এই জগতে দুইটি পুরুষ আছে, দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে, ক্ষর ও অক্ষর। বস্তুতঃ এই দুইটি হইতেছে একই ভগবানের দুই ভাব, এক ভাবে তিনি জগতের বহু রূপে আবির্ভূত হইতেছেন, দেব, মানব, জীব, জন্তু, স্থাবর, অস্থাবর সব হইতেছেন, পবিবর্ত্তন ও বিকাশের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। এখানে তিনি নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাই সব নহে, ইহা ছাড়াও আর এক পুরুষ রহিয়াছে, তাহা এই সব কিছুই নহে, তাহা শাশ্বত আত্মা, সর্ব্বদা একই ভাবে রহিয়াছে, তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন নাই, বিকাশ নাই. তাহা এক, অচল, কূটস্থ, প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যেও নিষ্ক্রিয়, তাহার গতির মধ্যে নিশ্চল। ঠিক যেমন আকাশের মধ্যে বায়ু রহিয়াছে, তেমনিই এই অক্ষরের মধ্যে ক্ষর বিধৃত রহিয়াছে।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯।৬

আমরা যত অন্তর্মুখী হই, প্রকৃতির গতি ও ক্রিয়াসকলের পশ্চাতে এক কূটস্থ, অচল, শাশ্বত সত্তার উপলব্ধি পাই, সেইটিই অক্ষর পুরুষ। অতএব জগতে আমরা দুইটি পুরুষ দেখিতে পাইতেছি, একটি সম্মুখে আসিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর একটি ইহার পশ্চাতে চির নীরবতা ও নিশ্চলতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; সেইখান হইতেই সকল কর্ম্ম উদ্ভূত হইতেছে এবং সেই কালাতীত সত্তাতেই সকল কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" এবং গীতার "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" একই। উপনিষদে এক বৃক্ষে দুই পক্ষী এবং এক অজা ও দুই অজের উপমা দিয়া রূপকের ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইয়াছে গীতায় তাহাই হইয়াছে দুই পুরুষের তত্ত্ব। সাংখ্যের সহিত তুলনা করিয়া বলা যায় যে, সাংখ্যের বদ্ধ পুরুষ হইতেছে গীতার ক্ষর পরুষ, প্রকৃতির বহুল লীলার সাক্ষী ইত্যাদি ভাবে অধিষ্ঠিত যে পুরুষ তাহাই ক্ষর পুরুষ ;* আর সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ হইতেছে গীতার অক্ষর পুরুষ, প্রকৃতি সেখানে নাস্তি, সেখানে প্রকৃতির লীলা একান্ত শান্ত হইয়া গিয়াছে, সমাহিত বা লুপ্ত হইয়া হইয়া গিয়াছে। অক্ষর পুরুষেরই অপর নাম Immutable Brahman। অতএব অক্ষর পুরুষ বলিতে মায়া বা প্রকৃতি বুঝা কিছুতেই চলে না। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। জগতে আমরা ক্ষর ও অক্ষর, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সচল ও অচল—এই দুই সত্তারই অনুভূতি পাই। কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী বলিয়াই মনে হয় এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোন বাস্তব সম্বন্ধ ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। সাংখ্য যে পুরুষ ও

---

* ক্ষরপুরুষ যে সেই জন্য বদ্ধ হইবেই তাহা নয়। কার্য্যতঃ অবশ্য দেখা যায় সে প্রকৃতির জালে আবদ্ধ—কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থাতেও সে থাকিতে পারে। জীবন্মুক্ত জীবে ক্ষরপুরুষ প্রকৃতির রসগ্রাহী হইয়াও প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

প্রকৃতির চিরদ্বৈত কল্পনা করিয়াছে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে এবং পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা, একটি অক্ষর অপরটি ক্ষর, প্রথম প্রথম মনে হয় যে, এইটিই অধিকতর সঙ্গত। আমরা প্রকৃতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্তরেব মধ্যেই এই অক্ষব সত্তার অনুভূতি লাভ করিব, আর যেহেতু প্রত্যেক পুরুষই আপন সত্তায় অপনি পূর্ণ, অনন্ত, সপ্রতিষ্ঠ, সেহেতু অন্য জীবেব সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাই আমাদের চবম অনুভূতি নহে, সে অনুভূতি হইতেছে সকল জীবেব সহিত, সর্ব্বভূতের সহিত মূল সত্তায় আমাদের ঐক্য, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, নাম রূপেব এই অনন্ত বৈচিত্র্যের পিছনে যে এক আত্মা বহিয়াছে তাহার সহিত তাদাত্ম্যবোধ। উপনিষদের ন্যায় গীতা এই উচ্চতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরেই দাঁড়াইযাছে। গীতা সাংখ্যের ন্যায়ই বহু জীবের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, গীতা অনন্তের মধ্যে জীবের ব্যষ্টিগত সত্তার সম্পূর্ণ লয়ের কথা কোথাও বলে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও গীতা জোর দিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব বহু জীবের এক আত্মা, অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এই দুই পুরুষই হইতেছে এক শাশ্বত ও বিশ্ব সত্তার দ্বৈত ভাব (a dual status)।

কিন্তু এই মহত্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি আমাদেব ঊর্দ্ধতম দৃষ্টির নিকট যতই সত্য হউক, যতই হৃদয়গ্রাহী হউক, ব্যবহারেব দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও এখানে যে বিরোধটি রহিয়াছে তাহার সমাধান করা একটি অতি বাস্তব ও গুরুতর সমস্যা। আমাদের ভিতরে ও বাহিরে আমরা অনবরত যে পরিবর্ত্তন ও সচলতা অনুভব করি, নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ, এই যে ক্ষরের অনুভূতি, শাশ্বত পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা আছে, ন ইদম্ যদ্ উপাসতে (কেন উপনিষদ); অথচ সেই সঙ্গেই এই

সবই হইতেছে সেই শাশ্বত পুরুষ, এই সবই আত্মার চিরন্তন আত্ম-দর্শন, "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ) শাশ্বত পুরুষই, সর্ব্বভূত হইয়াছেন "আত্মা অভূৎ সর্ব্বভূতানি" (ঈশা উপনিষদ) ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ যেমন বলিয়াছে, তুমিই ঐ কুমার, তুমিই ঐ কুমারী, আবার তুমিই ঐ বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে চলিতেছ ; ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, ব্যাস ও উশনা, তিনিই সিংহ, তিনিই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিনিই সকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, সকল গুণ এবং অন্তরাত্মা। কিন্তু এই দুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয় ? তাহারা যে স্বরূপে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, উপলব্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন আমরা বিবর্ত্তনের চঞ্চলতার মধ্যে বাস করি, তখন আমরা কালাতীত স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারিলেও তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি কি না সন্দেহ। আবার যখন আমরা কালাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন কাল ও দেশ ও ঘটনাপরম্পরা আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং অনন্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, প্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা ইহা ভ্রান্তি, যতক্ষণ আমরা ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ইহা সত্য কিন্তু মূলতঃ সত্য নহে, এবং সেই জন্যই যখন আমরা আত্মার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হই, উহা আমাদের নিষ্কলঙ্ক মূল সত্তা হইতে খসিয়া পড়ে। শঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই এই সমস্যার সহজ সমাধান করিয়াছেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা !

তাই শঙ্করের মতে নির্গুণ, নিরুপাধিক, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই পরম সত্তা ; সগুণ ব্রহ্মে মায়ার খেলা চলিতেছে অতএব তাহা নিম্নতর। গীতায় পুরুষোত্তমের যে বর্ণনা আছে, তিনি এই জগৎরূপে প্রকট হইতেছেন, জগৎকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, যুগে যুগে মানবরূপে অবতীর্ণ

হইয়া মানুষকে তাঁহার দিব্যজন্ম ও দিব্য কর্ম্মের আদর্শ দেখাইতেছেন, শঙ্করের মতে ইনি সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের নিম্নতর সত্তা। কিন্তু গীতা বলিয়াছে পুরুষোত্তম ক্ষর অক্ষর উভয়েরই ঊর্দ্ধে, অতএব এই অক্ষরকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে শঙ্করের নিজের মত দাঁড়াইতে পারে না, তাই তিনি বলিয়াছেন, অক্ষর হইতেছে মায়া শক্তি। কিন্তু গীতায় এখানে অক্ষরকে স্পষ্ট পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং অন্যত্র অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ *। আর এক স্থানে গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, পুরুষোত্তম ব্রহ্ম অপেক্ষাও বড়, তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। ১৪:৭

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র "অহম্" "মাম্" বলিতে পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন এবং এই পুরুষোত্তমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ৭।৭

জগতে যে অক্ষর ও ক্ষরের আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয় তাহার সমাধান করিতে গীতা শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্তু গীতার মতে উহা হইতেছে কেবল এক ভ্রান্তি-উৎপাদক আংশিক চেতনা, তাহা পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, চঞ্চলা প্রকৃতির ব্যাপার-সকলের মধ্যেই বাস করে, যে পুরুষের

---

* গীতা যে অক্ষরকে ব্রহ্ম পরমম বলিয়াছে, ইহার অর্থ নহে যে, এই অক্ষর পুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তা ; অক্ষর হইতেছে প্রকৃতির ক্ষরলীলার ঊর্দ্ধে, সেই জন্যই তাহাকে পরম্ বলা হইয়াছে, যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ। পুরুষোত্তম তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তায় অক্ষর বটেন, কিন্তু তাহা হইতেছে অব্যক্ত অক্ষর, আর এখানে যে অক্ষর পুরুষের কথা বলা হইতেছে তাহা এই ব্যক্ত জগতেরই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে।

সে সক্রিয় শক্তি, যে প্রকৃতিঃ, তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি, জগৎ লুপ্ত হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করিয়া আমরা দেখি না যে, এ-সবের কোন অস্তিত্বই নাই। পরন্তু দেখি যে, সবই আছে, কিন্তু যে অর্থে আছে তাহা বর্ত্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত সত্তা, ভাগবত প্রকৃতি, সবই বাসুদেব। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শাশ্বতের শক্তি, পরব্রহ্মের প্রকটন; এমন কি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতন প্রকৃতি ইহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। আর আমরা একান্তভাবে এই প্রভেদেরও আশ্রয় লইতে পারি না যে, এখানে দুইটি সত্তা রহিয়াছে, একটি নিম্নতন, সক্রিয় ও অনিত্য, আর একটি কর্ম্মের অতীত ঊর্দ্ধতন শান্ত স্তব্ধ শাশ্বত সদ্বস্তু, এবং আমাদের মুক্তির অর্থ হইতেছে এই আংশিক সত্তা হইতে উঠিয়া সেই মহৎ সত্তায় যাওয়া, কর্ম্ম হইতে নীরবতায় যাওয়া। কারণ গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে যে, যতদিন আমাদের জীবন ততদিন আমরা আত্মা ও তাহার নীরবতায় সচেতন হইয়া থাকিতে পারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম্ম করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্ত্তব্য। আর গীতা স্বয়ং ভগবানেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্ম-গ্রহণের বাধ্যতায় বদ্ধ নহেন, পরন্তু মুক্ত, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, অথচ তিনি চিরকাল কর্ম্মে রত রহিয়াছেন, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। অতএব সমগ্র ভাগবত প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াই এই দ্বৈত উপলব্ধির একত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু সেই একত্বের মূল সূত্রটি কি?

পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতার যে পরম দৃষ্টি তাহারই মধ্যে গীতা এই একত্বের সূত্রটি পাইয়াছে, কারণ গীতার মতে সেইটিই হইতেছে পূর্ণ ও উচ্চতম উপলব্ধির আদর্শ স্বরূপ, ইহা হইতেছে কৃৎস্নবিদ্‌গণের,

সমগ্র জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণের জ্ঞান। গীতা এই যে সমগ্র জ্ঞানের কথা বলিয়াছে ইহা দুর্লভ, ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্। কারণ মানুষের মনের স্বভাবই এই, ইহা সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, সমগ্রভাবে দেখিতে পারে না। গীতা-কথিত সমগ্র জ্ঞানলাভ করিয়া কৃৎস্নবিদ্ হইতে হইলে আমাদিগকে মন বুদ্ধির উর্দ্ধে উঠিয়া অতি-মানস সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। কার্য্যতঃ মানুষেব দার্শনিক চিন্তাধারা এই সমগ্র সত্যের এক একটি দিক বা অংশের উপরই ঝোঁক দিয়াছে। শঙ্কর যেমন অক্ষরভাব বা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপরেই জোর দিয়াছেন, পাশ্চাত্য দর্শনে তেমনই ক্ষরভাব বা সগুণ, সক্রিয় সবিশেষ ব্রহ্মেরই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্লেটোর বিকাশশীল ভগবান (Esomenos Theos), * স্পিনোজার Substance, হেগেলের Absolute. শোপেনহাওয়ারের Will, বার্গশঁর Elan Vital—সবই হইতেছে ক্ষর পুরুষ বা সগুণ ব্রহ্ম। প্লেটো বলিয়াছেন, উচ্চতম সত্য হইতেছে উচ্চতম সক্রিয়তা; স্পিনোজা বলিয়াছেন যেমন বৃত্তের (circle) মধ্যে ব্যাসার্দ্ধ (radii) অবশ্যম্ভাবী তেমনই ভগবানের মধ্যে কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। ফিশ্‌টে (Fichte) বলিয়াছেন, শুদ্ধ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় সত্তা বলিয়া কিছুই নাই, আমরা যাহাকে অচল অক্ষর সত্তা বলি সেটা কেবল একটা ভ্রান্তি, illusion। হেগেল বলিয়াছেন, Absolute বা ব্রহ্ম হইতেছে একটা গতি, একটা ক্রিয়া, একটা বিবর্ত্তন। সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও জীবনধারা এই শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক বিজ্ঞানের যাহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Law of Relativity), তাহা এই দার্শনিক মতেরই বৈজ্ঞানিক বিবৃতি,—এ জগতে স্থায়ী বা অচল কিছুই নাই, যেমন এক স্রোতে কেহ দুইবার

* The God who is to be.

স্নান করিতে পারে না তেমনি এক স্থানে কেহ দুইবার হস্ত রক্ষা করিতে পারে না। যাহা এক বস্তুর সম্বন্ধে অচল তাহাই আর বস্তুর সম্বন্ধে সচল। চলমান জাহাজের ডেকের উপর যখন আমি ভ্রমণ করি তখন আমার সম্বন্ধে জাহাজ অচল আমি সচল, সমুদ্রের সম্বন্ধে জাহাজ সচল সমুদ্র অচল, আবার সূর্য্যের সম্বন্ধে এই সমগ্র পৃথিবীই সচল, তেমনই নক্ষত্রদের সম্বন্ধে সৌরজগতও সচল, সবই চলিতেছে, এ-চলার আদি নাই, অন্ত নাই—এই বিশ্বব্যাপী চলিষ্ণুতার মধ্যে স্থিতি ও গতির গাণিতিক হিসাব করিতে হইলে যে সূত্রের (formula) প্রয়োজন আইনষ্টাইন তাঁহার Law of Relativityতে কেবল সেই সূত্রটি দিয়াছেন। *

আমরা দেখি গীতা বাহ্যজগতের এই তথ্যটি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।

প্লেটো ও স্পিনোজার ন্যায় গীতাও বলিয়াছে যে, সক্রিয়তা (activity) ভগবদ্ সত্তার অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে, সক্রিয়তা বা কর্ম্ম যেমন ভগবদ্ সত্তার

* আধুনিকতম বিজ্ঞানের মত এই যে, এই সূত্রকে আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক করা যাইতে পারে। আইনষ্টাইন জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে আপেক্ষিকতাবাদে উপনীত হইয়াছেন, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা অন্তর্জগতের অনুভূতি ও উপলব্ধির দ্বারা সেই আপেক্ষিকতাকে আরও ব্যাপকভাবে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ স্থিতি ও গতি, দেশ ও কাল বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা কেবল ব্যবহারিক সত্য, প্রকৃত যে সদ্‌বস্তু তাহা এই সব ধারণার অতীত। ঈশা উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫

অন্তর্নিহিত তেমনই নিষ্ক্রিয়তা বা নৈষ্কর্ম্যও তাহার অন্তর্নিহিত, এই দুইটি লইয়াই ব্রহ্ম, এই দুইটি লইয়া ব্রহ্মের দুইটি দিক। গীতার এ সিদ্ধান্ত শুধু যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহা গভীরতম অধ্যাত্ম অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জগতের ক্ষররূপ যেমন আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেছি, তেমনই গভীর আত্মানুভূতিতে আমরা এক অনন্ত, অক্ষর, অচল, অক্রিয় সত্তার উপলব্ধি পাই। শঙ্করের নিকট এই শেষোক্ত অনুভূতিটি বলবান, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট প্রথমোক্ত অনুভূতিটিই বলবান। গীতার উচ্চতর অনুভূতিতে এই দুইটিই হইতেছে এক সত্যের দুইটি দিক। আর শ্রুতিতেও আমরা দেখিতে পাই সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়েরই বর্ণনা আছে; উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মকে উভয়ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের ঋষি রামকৃষ্ণেরও অনুভূতি তাহাই, "জল নড়লে চড়লেও জল, স্থির থাকলেও জল" অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই।

অচল অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতি যে শুধু ভারতবাসীই লাভ করিয়াছে তাহা নহে, প্রাচীন গ্রীক ইলিয়াটিক (Eleatic) সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা এইরূপ অনুভূতির পরিচয় পাই। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক পারমিনাইডিজের (Parmenides) মতে ভগবানের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনই নাই, আর যেহেতু ভগবানই সব, আমরা যাহাকে পরিবর্ত্তন বলি তাহা ভ্রান্তি, বস্তুতঃ উৎপত্তি বা লয় বলিতে কিছুই নাই। তিনি যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র অনন্ত সত্তাই সত্য, সমস্ত পরিবর্ত্তন, বহুত্ব, খণ্ডত্ব হইতেছে অন্তর্বিরোধে পূর্ণ এবং এই জগৎ মিথ্যা, মায়া। তাঁহার শিষ্য জিনো (Zeno) শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়ই কূটতর্কের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সকল প্রকার গতি, পরিবর্ত্তন, সক্রিয়তা হইতেছে মিথ্যা বা ভ্রান্তি। কিন্তু ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের এই মত পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্যতম গ্রীক

দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ যে বলিয়াছেন, (perpetual flux) অবিরাম পরিবর্ত্তনই সত্য, এ জগতে স্থির, অচল, অক্ষর কিছুই নাই, এখানে আমরা "অবিরাম গতি নিয়ত ধাই"—ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তা-ধারাকে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জীবন ও কর্ম্মধারাকে নির্দ্ধারিত করিয়াছে। এই দুই মতের কতকটা সমন্বয় করিয়াছিলেন পিথাগোরাস্, প্লেটো এবং বিশেষতঃ এরিষ্টটল্। পিথাগোরাসের মত এই যে, যে-সকল বস্তু লইয়া এই জগৎ গঠিত সে-সবই নিজ নিজ সত্তায় অচল, অক্ষর, অপরিবর্ত্তনীয়, কেবল তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হয় এবং এই ভাবেই জগতের ক্ষরলীলা উৎপন্ন হয়। * প্লেটো হিরাক্লিটাসের ন্যায়ই বিশ্বাস করেন যে, এই দৃশ্য জগতে কিছুই স্থির নাই, সবই অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু এই দৃশ্য জগতের ঊর্দ্ধে এক ভাব-জগতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি ভাব (Idea) হইতেছে শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়, সদ্বস্তু—এই সকল ভাব হইতেছে ভগবানের চিন্তা; বাহ্যদৃশ্য জগৎ এই সকল ভাবকেই রূপ দিতে নিরন্তর প্রয়াস করিতেছে। বাহ্য জগতে আমরা যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর দেখি, সে সবই হইতেছে সেই দিব্য ভাবলোকের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া। প্লেটোর দর্শনে আমরা তিনটি তত্ত্ব পাই—ভগবান, ভাব (Idea) এবং জড় পদার্থ; ভগবান এই ভাব অনুসারে জড় জগৎকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতেছেন, এই জড় জগৎ হইতেছে a process of becoming। বেদান্তের ভাষায় প্লেটোর Ideaকে ভগবানের চিৎশক্তি বলিতে পারা যায়। প্লেটোর মতে এই Idea হইতেছে সৃজনী শক্তি, এই শক্তিকে প্লেটো কখনও ভগবানের উপরে স্থান দিয়াছেন, কখনও নিম্নে স্থান দিয়াছেন। তবে প্লেটোর অন্যান্য বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে ভগবান

* *পিথাগোরাসের এই মতটিই পাশ্চাত্য Monadismএর ভিত্তি-স্বরূপ।*

ও তাঁহার Idea বা চিৎশক্তি অভিন্ন এবং ইহা বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত। কেবল এই দৃশ্য জগৎ লইয়া প্লেটো সমস্যায় পড়িয়াছেন। এই জগৎ অসত্য, অশিব, অসুন্দরে পূর্ণ, ইহাকে কেবল ভগবানের চিৎশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহা সেই শক্তির সৃজনের উপাদান স্বরূপ অথচ পদে পদে তাহাকে বাধা দিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। তাই প্লেটো চিৎশক্তির ন্যায় এই অচিৎ জড়কেও অনাদি তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এইভাবে তিনি কতকটা সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতের ন্যায় দ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছেন।* সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি যেমন উভয়েই অনাদি, ও অনন্ত, প্লেটোর ভাব (Idea) ও জড় (Matter), চিৎ ও অচিৎ তেমনি অনাদি অনন্ত, এবং উভয়ের সংযোগেই এই বিশ্বজগৎ, এই দৃশ্য বিবর্ত্তনশীল ভগবান (ক্ষর পুরুষ) উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু চিৎ ও অচিৎ যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ হয় তাহা হইলে উভয়ের সংযোগ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্য এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই, কিন্তু বেদান্ত ইহার সমাধান করিয়া বলিয়াছে যে, দুইই মূলতঃ এক বস্তু। প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটলও এইরূপ যে সমাধান করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা গীতার সমন্বয়েরই আভাষ পাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অচিৎ হইতেছে চিৎশক্তিরই নীচের রূপ, ইহা ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের দ্বারা ইহার উর্দ্ধের সত্য স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই যে বিকাশ, এরিষ্টটলের মতে ইহা ভগবানের নহে। ভগবানই পূর্ণ, আদর্শ, তিনি যদি অপূর্ণ হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ণতার দিকে চালিত

---

* তবে সাংখ্যের চেতন পুরুষ নিষ্ক্রিয়, জড় প্রকৃতিই সক্রিয়; প্লেটোর ভগবান এবং তাঁহার চিৎশক্তি সক্রিয়, জড় প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টির উপাদান, নিষ্ক্রিয়, passive। মধ্বাচার্য্য বেদান্তের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যাহা দ্বৈতবাদ বলিয়া পরিচিত, প্লেটোর দার্শনিক মত অনেকটা তদনুরূপ।

করিবার জন্য আর একজন ভগবানের প্রয়োজন হইত—কিন্তু ভগবান হইতেছেন পরাৎপর এক, অতএব তিনি আপনাতে আপনি পূর্ণ; এবং তিনিই জগতের কারণ এবং তিনিই জগতের লক্ষ্যস্থল, তিনি বস্তু-সকলের মধ্যে তাহাদের সার সত্তারূপে অনুস্যূত রহিয়াছেন, অথচ তিনি সকল বস্তুর ঊর্দ্ধে, বিশ্বাতীত। তিনি নিজে অচল অক্ষর থাকিয়াও জগৎকে চালাইতেছেন। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব? একটি সুন্দর ছবি যেমন নিজে সম্পূর্ণ অবিচল থাকিয়াও আমাদিগকে বিচলিত করে, একটি সুন্দর আদর্শ যেমন আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, তেমনি ভগবানের অনাদি চিৎশক্তি জগৎকে চালিত করিতেছে, সেজন্য ভগবানকে বিচলিত হইতে হয় না।

এরিষ্টটলের এই সব সিদ্ধান্তের সহিত গীতার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, তাঁহার ভগবান গীতার পুরুযোত্তমের অনুরূপ, তাঁহার Eternal Idea গীতার পরা প্রকৃতি এবং তাঁহার অচিৎ গীতার অপরা প্রকৃতি। গীতা বলিয়াছে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে, অপরা প্রকৃতির মধ্যে তাহার যে বর্ত্তমান জীবন ইহার রূপান্তর সাধন করিয়া পরা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করা; এরিষ্টটল (এবং প্লেটোও) বলিয়াছেন, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করা। *

ভারতীয় আর্য্য দর্শনের যেমন সমন্বয় ও পরিণতি হইয়াছে গীতায়, তেমনই গ্রীক দর্শনের সমন্বয় ও পরিণতি হইয়াছে এরিষ্টটলে, এবং এই দুইটি অনেকটা সমসাময়িক। তাহার পর হইতে দুই দেশে দার্শনিক চিন্তাধারা মূলতঃ দুইটি বিপরীত পথ ধরিয়া চলিয়াছে, ইউ-রোপ চলিয়াছে ক্ষরের দিকে, ভারত চলিয়াছে অক্ষরের দিকে। আর,

* এই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই যীশু খ্রীষ্টের বাণীতে, "Be perfect as your Father in Heaven is perfect."

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। পাশ্চাত্য ক্রমশঃ বেশী বেশী বহির্মুখী হইয়া জড়বাদ ও ঐহিকতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, আর ভারত অন্তর্মুখী হইয়া জীবনকে, কর্ম্মকে অবহেলা করিয়াছে, অক্ষর আত্মার নিথর শান্তি ও নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে আত্মনির্ব্বাণকেই পরম সত্য ও লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শুনিয়াছিলেন, জগন্মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই কি অক্ষর হতে চাস্?" ভারত অক্ষর হইতেই চাহিয়াছিল তাই সে পাইয়াছে মায়াবাদ, passivism, সংসার বৈরাগ্য, সন্ন্যাস; আর পাশ্চাত্য ক্ষর হইতে চাহিয়াছিল তাই সে পাইয়াছে সক্রিয়তা, activism, তীব্র জীবন-লীলা। আর এই যে প্রভেদ, ইহা নিরর্থক নহে, ইহার মধ্যে আমরা ভগবানের ইচ্ছারই নিগূঢ় ক্রিয়া দেখিতে পাই। মানবজাতিকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে ক্ষর ও অক্ষর উভয় অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে হইবে, তবেই সে পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিয়া এই দুইয়ের সমন্বয়ে পূর্ণতম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারিবে। কিন্তু মানবজাতিকে যদি একে একে এই দুইটি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইত তাহা হইলে অনেক সময় লাগিত। এমন কি, একদিকে শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে আবার বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা যে অতিশয় কঠিন হইত তাহা আমরা বর্ত্তমান ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জীবনধারা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারি। ভারতের পক্ষে আজও মায়াবাদ এবং জীবন-ত্যাগের মোহ ছাড়াইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য ও আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। * অন্যদিকে জড়বাদ, ঐহিক সুখবাদের ভীষণ

---

* স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে Sister Christine তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—To hear him say "This indecent clinging to life," drew aside the curtain for us into the region beyond life and

পরিণতি উপলব্ধি করিয়াও পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে আজ অন্তর্মুখী হইয়া অধ্যাত্ম জীবনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা অতিশয় কঠিন হইতেছে। প্রকৃতি যে আজ ভারত ও পাশ্চাত্যকে পরস্পরের অতি নিকট ও নিবিড় সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছে ইহাতে উভয়েই উভয়ের সাহায্যে নিজ নিজ ত্রুটি ও অপূর্ণতা সংশোধন করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। আধ্যাত্মিকতা চাই-ই, কিন্তু তাহার অর্থ নহে এই দেহের জীবনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া; চাই এই দোষ-ত্রুটি-পূর্ণ দেহ, প্রাণ মনের অধ্যাত্ম রূপান্তর ও পূর্ণতাসাধন। ইহারই জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল এমন একটা যুগ যাহা জড় ও দৈহিক জীবনকেই প্রাধান্য দিবে এবং যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই জড়জগতের সত্যগুলিকে আবিষ্কার করিতে চাহিবে, পরন্তু জড় ও দেহকে শত্রু ভাবিয়া ভয় বা ঘৃণা করিবে না, ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিবে না। ইহাই হইতেছে আধুনিক জড়বাদ ও বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার সার্থকতা। ইহা প্রত্যেক জিনিষকে, এমন কি বুদ্ধিকেও জড়ভাবাপন্ন করিয়া অধ্যাত্মসাধনার পথকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু অন্যপক্ষে ইহা জড় ও দেহের জীবনকে যে প্রাধান্য দিয়াছে তাহা প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইয়াছিল। এখন আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য হইতেছে এই দৈহিক জীবনকে পরিত্যাগ করা নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

death, and planted in our hearts the desire for that glorious freedom. We saw a soul struggling to escape the meshes of Maya, one to whom the body was an intolerable bondage, not only a limitation but a degrading humiliation......The end to be attained was Freedom—Freedom from the bondage in which Maya has caught us, in which Maya has enmeshed all mankind —**Probuddha Bharat, May, 1931.**

অবলম্বন নহে, পরন্তু উর্দ্ধের অধ্যাত্ম শক্তিকে অবতরণ করাইয়া ইহা-দের দিব্য রূপান্তর সাধন করা, এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। পাশ্চাত্য সভ্যতার সুতীব্র সংস্পর্শে না আসিলে আমাদের পক্ষে অধ্যাত্ম সাধনার এই পথ ধরা সম্ভব হইত না।

সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের কবিরা গাহিয়াছেন,

কি ছার আর কেন মায়া,
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।

কিন্তু আজ সুর ফিরিয়াছে। আজ আমাদের গতি আধুনিক কবি বলিতেছেন,

এই দেহ তোর মিথ্যে নয়, দিনেক দু'য়ের সত্য রে,
অর্ঘ্য দে!

বিশ্বকবির হৃদয়ের আকুতি শুনিতেছি,

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!

আমাদের আধুনিক কবিবা যদি সন্ধান করেন তাহা হইলে গীতাব মধ্যেই তাঁহাদেব এই আকুতি ও আকাঙ্ক্ষাব অধ্যাত্ম ভিত্তিটি খুঁজিয়া পাইবেন। গীতা কুত্রাপি এই দেহকে ঘৃণা কবিতে বলে নাই, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে, এই মানব-দেহের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন, মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্, এই মানবদেহে অধিষ্ঠিত ভগবানকে যাহারা অবজ্ঞা করে তাহারা মূঢ়, এই দেহকে যাহারা পীড়ন করে তাহারা আসুরিক। গীতা বলিয়াছে, এই জগতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাহা কিছু আছে তাহার সারতত্ত্ব ভগবান নিজেই, রসোঽহমপ্সু, পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ। এই সংসারে সুন্দর, শক্তিমান, ঐশ্বর্য্যময় যাহা কিছু আছে বা হইতেছে সে-সবই ভগবানের বিভূতি, ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। ভগবানকে এই

জড়জগতেই আবিষ্কার করিতে হইবে, প্রকট করিতে হইবে, এই মর্ত্ত্য-জীবনকেই অমৃতত্বে পরিণত করিয়া পৃথিবীতে দিব্য ভোগ, দিব্যজীবন লাভ করিতে হইবে, ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্ম্ম আপন আপন ভাবে গীতার এই দিব্য ভোগের আদর্শটি ধরিবাব চেষ্টা করিয়াছিল, বলিয়াছিল,

কৃষ্ণের যতেক লীলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরদেহ তাহার সহায়।

কিন্তু তাহারাও এ-বিষয়ে গীতার শিক্ষাটী সমগ্রভাবে ধরিতে পারে নাই, হয় একদিকে অশুদ্ধ দৈহিক ভোগের তীব্র টানে ব্যাভিচারের মধ্যে পতিত হইয়াছে অথবা অন্যদিকে মায়াবাদের প্রভাব এড়াইতে না পারিয়া জীবনত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক বৃন্দাবনের সন্ধান করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশেও একটা স্রোত সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে, গিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে আধ্যাত্মিকতার জন্য কতকটা প্রস্তুত করিয়া বাখিয়াছে। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীগণ কৃচ্ছ্রসাধন এবং দেহের নিপীড়ন ব্যাপারে ভাবতের সন্ন্যাসীগণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, এখনও সেখানে অনেক মঠধারী সন্ন্যাসী রহিয়াছেন। তথাপি পাশ্চাত্য জীবনেব যাহা মুখ্য ধারা তাহা হইতেছে কর্ম্মেব দিকে, সংসারের দিকে, এই পার্থিব জীবনকেই পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার দিকে। আর ভারতের লোক সংসারত্যাগী না হইলেও সংসারকে মনে করে একটা কারাগার, একটা অশুভ। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য চিন্তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই বিশ্বাস যে, জগৎ এক উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে; পাশ্চাত্য জাতির যে স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা তাহাই তাহাদিগকে এই আদর্শে বিশ্বাসবান করিয়া

তুলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, এইটিই ছিল প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনের মূল তত্ত্ব। অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্পিনোজা এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে জগতের এইরূপ কোন উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্বীকার করিলে ভগবানেব পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয়। ভগবান এই জগৎরূপ কর্ম্মেব দ্বারা যে তাঁহার নিজের কোন অভাব বা ত্রুটি পূর্ণ করিতেছেন ইহা হইতেই পারে না, কারণ ভগবানের মধ্যে কোনও অভাব নাই, তিনি আপনাতে আপনিই পূর্ণ। তবে তিনি যে কর্ম্ম কবেন এটা তাঁহার স্বভাব। বেদান্তও জগৎকে বলিয়াছে ভগবানেব লীলা (sport); মায়া অপেক্ষা লীলা শব্দটির দ্বারাই বেদান্তেব মতটি ভালভাবে প্রকাশিত হয়। জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে, ইহা ভগবানেরই আত্মপ্রকটন, আত্মদর্শন, তবে এই প্রকাশ তাহাব নিজের কোন অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নহে, ইহা তাঁহাব লীলা। * কিন্তু এই জগৎ লীলা বলিয়া যে ইহাব কোন অর্থ নাই, ইহা একটা খেয়াল মাত্র তাহা নহে। মানুষ যখন খেলা কবে তাহাবও একটা পদ্ধতি থাকে, একটা goal বা লক্ষ্য থাকে। জগৎ-লীলার সে পদ্ধতি, সে লক্ষ্য কি? এ জগৎ যদি সচ্চিদানন্দ সত্য শিব সুন্দব ভগবানেব প্রকটন হয় তাহা হইলে এখানে এত অসত্য অশিব অসুন্দব কেন, শোক কেন, দুঃখ কেন, জরা ব্যাধি মৃত্যু কেন? প্লেটো কল্পনা কবিয়াছেন, ভগবানকে এক অচিৎ বস্তুর সহিত যেন দ্বন্দ্ব করিয়া জগৎমাঝে নিজেকে প্রকট করিতে হইতেছে, তাই তাঁহার সত্যস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে না। বেদে দেব ও অসুরের সংগ্রাম, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মে আহুরামাজ্দা ও অহ্রিমানের সংগ্রাম এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মগুলিতে এক-

* গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ৩।২২

দিকে ভগবান ও তাঁহার দেবদূতগণ এবং অন্যদিকে সয়তান বা ইব্‌লিস এবং তাহাদের সহচরগণের সংগ্রাম—এই সবেরই মূলে রহিয়াছে অনুরূপ পরিকল্পনা। কিন্তু ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তি বা তথ্য কল্পনা করিলে ভগবানের অনন্ততা ও পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয়, এই জন্য ভারতের কোনও ধর্ম্মে এরূপ কল্পনা প্রশ্রয় পায় নাই, সংসারে অশুভ ও দুঃখের জন্য ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও দায়ী করিয়া ভগবান সম্বন্ধে আমাদের মানবোচিত ধারণাকে বজায় রাখিবার প্রয়াস করা হয় নাই। গীতা বলিয়াছে, যেমন শুভ ভগবান হইতে আসিয়াছে তেমনই অশুভও ভগবান হইতে আসিয়াছে, জগতের যে সংহার-মূর্ত্তি তাহা ভগবানেরই একটি রূপ; ভগবান বলিয়াছেন তিনি নিজেই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা আবার নিজেই সকলের সংহার-কর্ত্তা,

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। ১০।৩৪

জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যাহা কিছু আছে সবই আসিয়াছে ভগবান হইতে (৭।১২)। এই যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, অচিৎ, জড়, যাহা ভগবানের আত্মপ্রকটনের উপাদান বা আবার অথচ সেই প্রকটন-কেই পদে পদে বাধা দিতেছে, ইহা ভগবানেরই অপরা প্রকৃতি, জড়ের মধ্যে নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকট করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজেই নিজের এই বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বাধা যেমন দুরূহ, এই বাধা যখন বিজিত ও অতিক্রান্ত হইবে সেই সৃষ্টিও হইবে তেমনই অভূতপূর্ব্ব গৌরবপূর্ণ, আশ্চর্য্যময়। মানুষের মনবুদ্ধির দ্বারা জগৎলীলার ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক আর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

বার্গশঁ বলিয়াছেন, এই জগৎ এক অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, এই প্রাণ-শক্তি তাহার চির-শত্রু জড়ের

উপর শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইবে এবং এই মর্ত্ত্যজগতেই অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে। * কিন্তু কিরূপে ইহা হইবে বার্গশঁ তাহার কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। তাঁহার মত যেন এই যে, প্রাণশক্তি যথেষ্ট সময় পাইলে আপনিই এই পরম বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

কিন্তু যাঁহারা গভীরভাবে এই মানবজীবন ও জগৎকে লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহারা সকলেই বার্গশঁর ন্যায় আশাবাদী হইতে পারিতেছেন না। পাশ্চাত্যদেশেও শোপেন্‌হাওয়ারের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার মতে এই জগতের মূলে রহিয়াছে এক অচিৎ ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তি অনন্ত জীবনপরম্পরা এবং সেই সঙ্গে অনন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে। জীবনের অর্থই দুঃখ; বিশুদ্ধ সুখ বা আনন্দ হইতেছে কবির কল্পনা। কেবল অভাবাত্মক কল্যাণ অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে এবং তাহার উপায় হইতেছে, আমাদের মধ্যে জীবনলীলার যে প্রেরণা রহিয়াছে, will to live, সেইটিকে নিৰ্ম্মূল করা। মানুষ যখন সংসারের জীবন ও তাহার সুখসম্পদের শূন্যতা, ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া জীবনের প্রবৃত্তিকে বর্জ্জন করে তখনই সে হয় মুক্ত। শোপেন্‌হাওয়ারের এই শিক্ষায় ভারতীয় দুঃখবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট; তিনি নিজেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দুঃখতাপময় সংসারে একমাত্র বেদান্তের শিক্ষা হইতেই তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছেন। আধুনিক মনোবিকলন শাস্ত্র (psycho-analysis) মানব চরিত্রের

* "The animal takes its stand on the plant, man bestrides animality, and the whole of humanity, in space and time, is one immense army galloping beside and before and behind each of us in an overwhelming charge able to beat down every resistance and clear the most formidable obstacles, perhaps even death."—**Creative Evolution.**

বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্যেই উপনীত হইতেছে। এই শাস্ত্র মানুষের অবচেতনার মধ্যে এমন সব অন্ধকার জিনিষের সন্ধান পাইতেছে যে-সব হইতেছে মানুষের সুখ শান্তির চির বিরোধী। কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, পরপীড়ন প্রবৃত্তি (Sadism), আত্মপীড়ন প্রবৃত্তি (Masochism),—এ-সব হইতেছে মানুষের মজ্জাগত; মানুষ যতদিন এই সবকে প্রশ্রয় দিবে ততদিন সভ্যতা আর একটি পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। যতদূর আসিয়াছে এইখানেই চিরকাল ঘুরিতে হইবে, উর্দ্ধ-দিকে আর উঠিতে পারিবে না। যাঁহারা জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন, শান্তির রাজ্য, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিতেছেন, মানুষের এই সব আসুরিক প্রবৃত্তি তাঁহাদের সকল প্রয়াসকেই ব্যর্থ করিয়া দিবে। আর মানুষ যদি এই সব প্রবৃত্তিকে দমন করিতে অগ্রসর হয় তাহাতেও কল্যাণ নাই, কারণ সেই দমন প্রচেষ্টায় মানুষের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িবে, মানবজাতি ক্রমশঃ জড়ত্ব ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবে। আমরা বর্ব্বরদের যতই নিন্দা করি না কেন, বর্ব্বরদের মধ্যে একটা মস্ত গুণ রহিয়াছে, তাহাদের প্রাণশক্তি প্রচুর। প্রাচীন গ্রীক জাতি এবং প্রাচীন ভারতীয় জাতি অতিমাত্রায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, শাস্ত্র ও বিধিনিষেধের চাপে নীচ প্রবৃত্তি-সকলের নিগ্রহ করিবার, জোর করিয়া চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার পরিণাম হইয়াছে এই যে, একটি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আর একটি কোনরকমে জীবন্মৃত অবস্থায় এখন পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। মানুষের প্রাণশক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে তাহার মধ্যে কিছু বর্ব্বরতাকে প্রশ্রয় দিতেই হইবে। যুদ্ধবিগ্রহের নৃশংসতা জগৎ হইতে উঠিয়া গেলে, সেই শান্তি মানবজাতির মৃত্যুর শান্তিতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আধুনিকতম পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। গীতাও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এবং বিশ্বরূপের সংহার মূর্ত্তিতে জগতের ও মানব-

জীবনের এই অশুভ রূপটি স্বীকার করিয়াছে, ইহার দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিবার মত দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় শান্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে; বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। ইতিমধ্যে স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী শক্তি-সকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্য ভীষণ ও দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে।

আধুনিক মনোবিকলন শাস্ত্র মানবচরিত্রের বর্ত্তমান অশুভ স্বরূপটিই দেখিতেছে, কিন্তু ইহার যে পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর সাধিত হইতে পারে সে-তথ্যের সন্ধান পায় নাই, গীতোক্ত সাধনায় আমরা তাহার সন্ধান পাই। সাংখ্য জাগতিক জীবনের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে, জগতের বর্ত্তমান অশুভ স্বরূপের বর্ণনা হিসাবে গীতা সেইটিই গ্রহণ করিয়াছে। এই জগৎ হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের খেলা। এই তিন গুণ পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে, কখনও সত্ত্ব প্রবল হইতেছে, কখনও রজঃ, কখনও তমঃ, এই ভাবেই যেমন বাহ্য জগতে তেমনিই অন্তর্জগতে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মানবজাতির মধ্যে আমরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেখিতে পাই, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ, সত্য শিব সুন্দরের আদর্শ এবং এই সব আদর্শ অনুসারে মানবজীবনকে গঠন করিবার প্রয়াস—এসব হইতেছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। আর জগৎ জুড়িয়া চলিয়াছে বাসনা ও অহমিকার দ্বন্দ্ব, একে অপরকে আয়ত্ত করিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য, গ্রাস করিবার জন্য তীব্র প্রয়াস করিতেছে, এবং এইভাবে সংসারে অশেষ দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, এ-সব হইতেছে রজোগুণের ক্রিয়া। আবার সেই সঙ্গে দেখা যাইতেছে

প্রতিক্রিয়া, অবসাদ, অপ্রবৃত্তি, মোহ, জড়তা—এ-সব হইতেছে তমোগুণের ক্রিয়া। দেশ ও কাল ভেদে কখনও এক গুণের, কখনও আর এক গুণের প্রভাব হইতেছে, কেহই এক অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিতেছে না,

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

মানবজাতির মধ্যে কোন সময়ে সত্ত্বগুণের যতই প্রাধান্য হউক, সত্যযুগের আভাস যতই প্রকট হউক, মানুষ যতই উচ্চতর সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের স্বপ্ন দেখুক, রজঃ এবং তমঃ যেন ওত পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং দুই দিন আগেই হউক আর পরেই হউক সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এ জগতে কোন সুখই খাঁটি নহে, কোনও লাভই স্থায়ী নহে, অনিত্যং অসুখং লোকং। যাহারা রাজসিক প্রকৃতির লোক তাহারা এই দ্বন্দ্বময় জীবনই ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা যে উচ্চতর, পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর জীবন হইতে পারে তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। তাহাদের মতে ইহাই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ, ইহা ছাড়িয়া তাহারা নির্ব্বাণ বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে না। যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, জীবনের এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই, তাহারা গড্ডালিকার ন্যায় স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। কেবল যাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিশেষ স্ফুরণ হইয়াছে তাহারাই এই অশান্ত জীবনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না ; তাহারা অন্তরাত্মার বাণী শুনিতে পায়, ন ইদম্ যদ্ উপাসতে, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর, সমৃদ্ধতর জীবন আছে। কিন্তু সে-জীবন লাভের পন্থা কি ? ভারতের সন্ন্যাসীগণ দেখিয়াছেন যে, জাগতিক জীবনের স্বরূপই হইতেছে ত্রিগুণাত্মক, অতএব ইহার উপরে উঠিতে হইলে জীবনকে ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। গীতাও এই

পন্থা স্বীকার করিয়াছে, বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষ এই জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, বস্তুতঃ ইহা করিতেই হইবে। কিন্তু গীতা এইখানেই থামে নাই। এই অধ্যাত্ম অবস্থা লইয়া আইসে নীরব শান্তি ও মুক্তি, কিন্তু ইহা শক্ত্যাত্মক (dynamic) দিব্য জীবন আনিয়া দেয় না, পূর্ণতম সিদ্ধি আনিয়া দেয় না। ইহা খুব উচ্চ গতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটিই সমগ্র ভগবদ্ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে। গীতা দেখাইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা নীচের প্রকৃতিই মানুষের জীবনের গূঢ়তম সত্য নহে, সে ভগবানের এক পরম আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে; মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে এখন যাহা কিছু অপূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে, সে-সবেরই উচ্চতর সত্যের মূল রহিয়াছে ঐ প্রকৃতির মধ্যে, তাহা এখনও প্রকট হয় নাই। নীচের মানসিক প্রকৃতি হইতে এই পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়াই মানুষ ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্ত হইবে, নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া জানিতে পারিবে। তখন হইতে তাহার চৈতন্যময় দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয় সব কিছুকেই ভগবানের ইচ্ছা ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করিবে। বিশ্ব চৈতন্য ও শক্তির একটি অংশরূপে সে জীবন যাপন করিবে, পরম ভাগবত আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিবে, কর্ম্ম করিবে। তাহার কর্ম্ম হইবে দিব্য কর্ম্ম, তাহার পদ (status) হইবে উচ্চতম অধ্যাত্ম পদ।

পাতঞ্জল দর্শন ও গীতা

গীতা মুখ্যতঃ যোগশাস্ত্র। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তি-প্রদর্শক যে সঙ্কল্প আছে তাহতে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত যোগশাস্ত্র। গীতায় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থাকিলেও কেবল সেই বিদ্যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্যই গীতা রচিত হয় নাই। সেই বিদ্যার আলোকে কেমনভাবে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হয়, কি ভাবে সংসারে থাকিয়া সংসারের কর্ম্মাদি করিলে এই সংসারেই দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারা যায়, প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ অর্থাৎ শরীর ত্যাগের পূর্ব্বেই কেমন করিয়া অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায়—গীতায় তাহার ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই অপূর্ব্ব সাধন-প্রণালীই গীতার যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গীতার উপসংহারে সঞ্জয় গীতোক্ত উপদেশের নাম "যোগ" দিয়াছেন,

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ১৮।৭৫

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই যে যোগ উপদেশ দিয়াছেন, ইহা কি? যোগশাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ পতঞ্জলির যোগসূত্রই বুঝায়। ঐ যোগ রাজযোগ। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যদি সিদ্ধান্ত করি যে,

গীতাতে পাতঞ্জল-যোগসূত্রে বর্ণিত রাজযোগেরই ব্যাখ্যা বা সঙ্কলন আছে, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। অনেক গীতা-আলোচনাকারী পতঞ্জলির যোগের সহিত গীতার যোগকে এক বলিয়া বুঝিয়া অশেষ গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতাব ইংরাজী অনুবাদক টম্‌সন সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন, গীতার কর্ম্মযোগ পাতঞ্জল-যোগেরই রূপান্তর। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকাবে পাঠ করিলেই বুঝা যায়, গীতার যোগ পাতঞ্জলসূত্র-বর্ণিত রাজযোগ নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতার সহিত পাতঞ্জল দর্শনের কি সম্বন্ধ তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সাংখ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে, তাহার উপরেই পাতঞ্জল যোগের ভিত্তি। তফাতের মধ্যে সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, পাতঞ্জল স্বীকার করে। এইজন্য পাতঞ্জল-দর্শনের আর এক নাম সেশ্বর সাংখ্য। পদার্থ-নির্ণয়াংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের কোন ভেদ নাই। সাংখ্যে যেমন পুরুষ, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—এইজন্য পাতঞ্জল-দর্শনের আর এক নাম সাংখ্য-প্রবচন। তবে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপব পাতঞ্জল ঈশ্বরতত্ত্ব যোগ করিয়াছে, ফলে পাতঞ্জলের হইয়াছে ষড়বিংশতিতত্ত্ব। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা করায় সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জলের কার্য্যতঃ বিশেষ কোন তফাৎ হয় নাই; কারণ পাতঞ্জলের যোগে ঈশ্বরের স্থান খুবই গৌণ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল উভয়েরই আরম্ভ ও লক্ষ্য এক। এই সংসার দুঃখময়; দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইতেই সংসার-লীলা এবং এই সংসার-লীলাই যত দুঃখের মূল। পুরুষ অজ্ঞানের বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া মনে করে; তাহাতেই প্রকৃতি লীলার

সুযোগ পায় এবং পুরুষকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পুরুষ যে সংসার-লীলায় সুখ অনুভব করে তাহারও পরিণাম দুঃখ; অতএব সংসারে আগত অনাগত সমস্ত সুখ দুঃখ বস্তুত দুঃখ, অতএব হেয় অর্থাৎ পরিত্যজ্য। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হইলে পুরুষ যখন নিজের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করে, প্রকৃতি হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে, প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেলা বলিয়া ভ্রম না করে, তখনই প্রকৃতির লীলা সংসার বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষের দুঃখ-ভোগও বন্ধ হয়, পুরুষ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করে। এ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলে কোন তফাৎ নাই। তফাৎ হইয়াছে উভয়ের সাধন প্রণালী লইয়া, কি উপায়ে এই মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করিতে পারা যায় তাহা লইয়া। পুরুষের যখন জ্ঞান হইবে, আপনার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে পুরুষ যখন সচেতন হইবে, তখনই তাহার মুক্তি হইবে—সাংখ্যের এই কথা পাতঞ্জল স্বীকার করিয়াছে,

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। পা ২'২৬

অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ সম্বন্ধে অটুট-জ্ঞান যখন চরম ভাবে লাভ করা যায় তখনই হয় মুক্তি। অতএব জ্ঞানই হান বা মুক্তির উপায়। কিন্তু কেমন করিয়া এই বিবেক-খ্যাতি, এই ভেদ-জ্ঞান লাভ করা যায়? সাংখ্য বলিয়াছে, বুদ্ধির দ্বারা বিচারের ফলেই এই বিবেক লাভ করা যায়; পতঞ্জলি বলেন, আগে চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হইতে পারে না। পতঞ্জলি যে-প্রণালীর দ্বারা জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ চিত্তকে শুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ,

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

—পা ২।২৮ সূত্র

অর্থাৎ, যোগাঙ্গ-সকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানের

উৎকর্ষ হইতে হইতে পরিণামে বিবেক খ্যাতি হয়। বিবেক খ্যাতিই জ্ঞানের শেষ সীমা।

পতঞ্জলির যোগ বুদ্ধির তর্ক-যুক্তি-বিচাররূপ জ্ঞান যোগ নহে। চিত্তের চাঞ্চল্যই আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বা বিবেকের বাধা। জল যখন আলোড়িত হইতে থাকে তখন তাহাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িতে পায় না। জল স্থির হইলে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনি চিত্ত যখন স্থির প্রশান্ত হইবে তখন প্রকৃত জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। তাই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা পাতঞ্জল দর্শনের মূল সূত্র,— যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল সাংখ্যের মূল কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে, কেবল তাহার উপর নিজের ঈশ্বরতত্ত্ব যোগ করিয়া দিয়াছে, এবং বিবেকখ্যাতির উপায়স্বরূপ কেবল বুদ্ধি-বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া এক বাঁধাধরা গণা-গাঁথা যোগ-প্রণালীর শিক্ষা দিয়াছে। সাংখ্যকে লইয়া পাতঞ্জল যাহা করিয়াছে, গীতাও কতকদূর ঠিক তাহাই করিয়াছে: সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-প্রভেদ ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ লইয়াই গীতার আরম্ভ; কিন্তু পাতঞ্জলের ন্যায় গীতাও বলিয়াছে যে, সাংখ্যের ন্যায় শুধু জ্ঞান ও সন্ন্যাসের উপর নির্ভর করিলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, পরন্তু যোগের সাহায্য গ্রহণ করিলে সহজেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়—

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৫।৬

সাংখ্যের সাধনায় কর্ম্ম বা ভক্তির কোনও স্থান নাই—পাতঞ্জল ঈশ্বরে ভক্তি, ঈশ্বরার্থে কর্ম্মকে যোগের সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং এখানেও পাতঞ্জলের সহিত আমরা গীতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই;

কিন্তু পাতঞ্জলের সহিত গীতার এইরূপ কতকটা মিল থাকিলেও, গীতা পাতঞ্জলকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথমতঃ,

পতঞ্জলির যোগে কর্ম্মের স্থান খুব নীচে। যাহারা উচ্চাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে সমর্থ নহে—তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধনারূপে কর্ম্মের উপযোগিতা আছে; কিন্তু যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা করিতেছেন তাঁহাদের কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম তাঁহাদের বাধা-স্বরূপ। প্রথমাবস্থায় কর্ম্মের দ্বারা যে যোগের পথে উঠিতে সাহায্য হয়, তাহাও সকল কর্ম্মের দ্বারা নহে। কর্ম্মসকলই বন্ধনের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকল প্রকার কর্ম্মেরই ফল আছে: এবং সেই ফল ভোগ করিতে জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে সাংখ্যে যেমন কর্ম্মের কোথাও কোন স্থান নাই—কর্ম্ম-সন্ন্যাসই সাংখ্যের প্রাথমিক সাধনা, পাতঞ্জল তাহার পরিবর্ত্তে বলিয়াছে যে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে ক্রিয়াযোগ সহায়স্বরূপ। কিন্তু সকল প্রকার কর্ম্ম নয়,—তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—এই তিনটিই ক্রিয়াযোগ। এই সকল কর্ম্মের সাধনা দ্বারা অজ্ঞান, বাসনা, অহঙ্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, সমাধির সহায়তা হয়—

> তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। পা ২।১
>
> সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ পা ২।২

যখন সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে, তখন কর্ম্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না বটে, তবে তখন কর্ম্মের কোন উপযোগিতা বা সার্থকতা নাই। জীব তখন কৈবল্য লাভ করিয়াছে, তখন আর সংসারও নাই, কর্ম্মও নাই। তখন আছে শুধু অচল, অক্ষর, উদাসীন পুরুষের নীরব নিথর শান্তি, শুদ্ধ নির্ম্মল চৈতন্য ও অনাবিল অখণ্ড প্রসন্নতা। অতএব শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জল এক; কিন্তু গীতা উভয়কেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। গীতার মতে কর্ম্ম শুধু প্রাথমিক সাধনা নহে, কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত যোগের অঙ্গ; এবং সিদ্ধির পরও সংসার ও কর্ম্ম পূর্ণ মাত্রাতেই চলিতে থাকে।

আর গীতার মতে, কর্ম্ম কেবল তপস্যা, স্বাধ্যায় বা যাগযজ্ঞাদি ঈশ্বরোপাসনা নহে,—গীতার মতে সর্ব্বকর্ম্মাণি, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়াই যোগকে সার্থক করিয়া তুলিতে হয়—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতম্ পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

সর্ব্বদা সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তি মৎপ্রসাদে অনাদি অব্যয় পদ লাভ করে।

গীতা সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই উৎসাহের সহিত করিতে বলিয়াছে, তামসিকতা ও জড়তাকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া গীতা আধুনিক কর্ম্মবাদের (activism) আদর্শ প্রচার করিয়াছে ইহা মনে করা ভুল হইবে। প্রাণ ও মনের নানা বাসনা কামনা আদর্শকে অনুসরণ করিয়া অস্থির ভাবে কর্ম্ম করা—ইহাই হইতেছে আধুনিক আদর্শ, ইহার মূলে রহিয়াছে রজঃগুণ এবং ইহার ফল হইতেছে দুঃখ. রজসস্তু ফলং দুঃখং। আধুনিক কর্ম্মবাদ সংসারে যে দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইতেই গীতার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়—

উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।

কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২।৪৭

"কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মেই অধিকার, ফলে নহে; কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা যেন কখনও তোমার কর্ম্মের প্রেরণা না হয়, আর কর্ম্মত্যাগেও যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়।"

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ,

কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত বিমূঢ় হন কারণ তাঁহারা কর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব তাহার সন্ধান কবেন না, পরন্তু সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ ও বিধিনিষেধ প্রভৃতি বাহ্য তত্ত্ব-অনুসারে কর্ম্ম বিচার করেন, অহিংসা, গুরুভক্তি, দেশপ্রেম, জীবে দয়া, জনসেবা প্রভৃতি আদর্শ অনুসরণ করিতে চান, বস্তুতঃ এ সবের দ্বারা কর্ম্মের চরম মীমাংসা হয় না। অর্জ্জুন শাস্ত্রজ্ঞ, হৃদয়বান, ন্যায়পরায়ণ, উন্নতচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সন্ধিক্ষণে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধ করা তাঁহার স্বধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ইহা অর্জ্জুন বেশই জানিতেন এবং চিরকাল সন্তুষ্টচিত্তে তিনি এই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া, গুরুজনকে হত্যা করিয়া সেই শ্রেয়ঃ কেমন করিয়া লব্ধ হইবে তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইল না—

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

আজও আমরা দেখিতে পাইতেছি, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জ্জাতিকতা-বাদ, সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অ্যানার্কিজম্, ফ্যাসিজিম্, কত নীতি কত আদর্শ ই মানুষের সম্মুখে ধরা হইতেছে, প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে কেবল তাহার দ্বারাই জগতের হিত সাধিত হইবে। এই সব দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন, সকল কর্ম্ম সকল জীবনই মিথ্যা কি না? শ্রান্ত, ক্লান্ত মানবাত্মার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ, "অকর্ম্ম"ই চরম আশ্রয় কি না? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এইভাবে মেধাবী ব্যক্তিগণও ভ্রান্ত হন, কারণ কর্ম্ম-ত্যাগের দ্বারা নহে, "অকর্ম্মের" দ্বারা নহে, পরন্তু কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করা যায়। কর্ম্ম কি, তাহার প্রকৃত উৎস ও প্রক্রিয়া কি, কর্ম্মের সমুচ্চ উপযোগিতা কি, সার্থকতা কি, সাধারণ মানুষ তাহা বুঝে না। রাজসিক প্রেরণার বশে তাহারা কর্ম্ম করে,

কর্ম্মকে তাহাদের বাসনা কামনার তৃপ্তির উপায় বলিয়াই মনে করে, সে কামনা ক্ষুদ্র পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা হইতে পারে, অথবা দেশের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ, মানবজাতির কল্যাণের কামনা হইতে পারে। এই সবই হইতেছে অজ্ঞানের ক্রিয়া, এইরূপ অহংভাব ও বাসনার বশে কর্ম্ম করিয়া মানুষ সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে পূর্ণ জীবনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কর্ম্মের উদ্দেশ্য শুধু কোন বাহ্যিক ফল লাভ করা নহে ; আমরা মনে করি আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমাদেব আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল করিব, দেশের মঙ্গল করিব, জগতেব মঙ্গল করিব—কিন্তু ইহা ভুল। কারণ সংসারে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, আর আমাদের কর্ম্মের দ্বারাও আমরা ইচ্ছামত জাগতিক ঘটনার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি না। অজ্ঞান অহঙ্কারের বশে আমরা ইহা স্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং জগতের ইতিহাসও সর্ব্বদাই আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিতেছে। আমরা অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিলেও অনেক সময় তাহার ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। কোন এক উচ্চতর শক্তি মানুষেব সকল প্রয়াস, সকল কর্ম্মকে অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত অজ্ঞান আশা আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাহ্য করে না। যে মোগল সম্রাট ইংরাজ বণিককে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, অথবা যে-সকল ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া হতভাগ্য সিরাজ-দ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মের ফল কতদূর গড়াইবে ? নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে পলাশীর প্রাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া সিরাজদ্দৌল্লা কি নৃশংস মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন ? যদি তিনি দেশের জন্য সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিবার মহৎ সঙ্কল্প লইয়া সেইদিন

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত; বাংলার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে জগতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে, তাই যুদ্ধ করিতে আসিয়াও সঙ্গীন মুহূর্ত্তে সিরাজের বীর হৃদয় সহসা দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। ১৯১৪ সালেব ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী পরিকল্পনা করিয়াছিল, কয়েক-দিনেব মধ্যেই প্যারিসের বুকের উপর বসিয়া সন্ধি সর্ত্ত রচনা করিবে। সামরিক শক্তির হিসাব করিতে জার্ম্মানীর নেতাদের কোন ভুল হয় নাই, কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ হিসাব করিয়াছিলেন। জার্ম্মানী যে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী লইয়া প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কাহারও তখন সাধ্য ছিল না যে তাহার গতি রোধ করে। কিন্তু সহসা কি ভাবিয়া একজন জার্ম্মান সেনাপতি নিজেই একস্থানে থামিয়া গেলেন, ফরাসী ও ইংরাজ নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইল, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেব ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেল। এই সব দেখিয়াও যাহারা মনে করে যে, ব্যক্তিগত কর্ম্মের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে তাহারা কি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নহে? বস্তুতঃ মানুষের কর্ম্মের লক্ষ্য বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা ফল-লাভ নহে, তাহার কর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিকাশ ও রূপান্তর সাধন। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কি করে বা না কবে তাহাতে বাহ্য জগতের ঘটনার ব্যতিক্রম হয় না। অহিংসা মন্ত্র জপ করিয়া অর্জ্জুন যদি যুদ্ধে বিরত হইতেন তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ রক্ষা পাইতেন না, কারণ ভগবান পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে মারিয়া রাখিয়া ছিলেন, অর্জ্জুন নিমিত্ত না হইলে ভগবান আর কাহাকেও যন্ত্র করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।

যাঁহারা এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মের দ্বারা জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "তুমি কে যে জগতের উপকার করিবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।" তাই জ্ঞানী ব্যক্তি ফল-কামনাশূন্য হইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করেন, যেন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছার বিশুদ্ধ যন্ত্র হইতে পাবেন। ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, কর্ম্মের কোন লক্ষ্য থাকিবে না এবং কর্ম্ম যাহাতে সাফল্যলাভ করে সে জন্য পূর্ণ উদ্যম ও প্রয়াস থাকিবে না; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে বলিয়াছিলেন, যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্। সাত্ত্বিক কর্ম্মীর লক্ষণ হইতেছে, তিনি ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত, তিনি অটল ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তিনি কর্ম্মকে সফল করিতে চান, কিন্তু নিজের জন্য নহে, নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের মানসিক কোন আদর্শ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কর্ম্ম করেন না, তিনি দেখেন তাঁহাকে কি করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্য বা কর্ত্তব্য কি, এবং সেই কর্ত্তব্য তিনি পূর্ণ উৎসাহ ও ধৈর্য্যের সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। আমাদের কর্ত্তব্য কি ইহা নির্দ্ধারণ করিতে অবশ্য প্রথমে আমাদের মন বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, আমরা সমাজের প্রচলিত আদর্শ ও শাস্ত্র হইতে এই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে সাহায্য পাই, কিন্তু ইহাই কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে—এইভাবে নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইলে সঙ্গীন মুহূর্ত্তে অর্জ্জুনের ন্যায় একদিন আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িব। ভিতরে ভগবানের বাণী শুনিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অর্জ্জুন যেমন শেষে বলিয়াছিলেন,

করিষ্যে বচনং তব, "হে আমার অন্তর্য্যামী ভগবান! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বিচার করি না, তুমি আমার হৃদয় হইতে আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব।" কিন্তু অন্তরের মাঝে ঠিকমত ভগবানের বাণী শুনিতে হইলে অন্তরকে আগে শুদ্ধ করিতে হইবে—নতুবা আমাদের নিগূঢ় বাসনাকামনা-সকলের প্রেরণাকেই আমরা ভগবানের বাণী বলিয়া ভুল করিব। অন্তরকে এইরূপ শুদ্ধ করিবার উপায় হইতেছে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা, যাহা কিছু আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে তাহাই ভগবানের সেবা হিসাবে, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞহিসাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং তাহার ফলাফল যাহাই হউক তাহাতে বিচলিত না হওয়া। ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম অবস্থা। এইভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের যেমন চিত্তশুদ্ধি হইবে, আমরা উপলব্ধি করিব যে, আমরা কোন কর্ম্মই করিতেছি না, প্রকৃতিই আমাদের দেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়া সকল কর্ম্ম করিতেছে, আমরা কেবল তাহার যন্ত্র মাত্র। ক্রমশঃ আমরা উপলব্ধি করিব যে, এই প্রকৃতি হইতেছে ভগবানেরই শক্তি এবং মূল সত্তায় আমরা সেই ভগবানের সহিত এক, এবং আমাদের প্রকৃতি জগতে ভগবানের আত্ম-প্রকাশের একটি আধার বা যন্ত্র—তখন আর আমাদের কোন ক্ষুদ্র অহংভাব থাকিবে না, আমাদের ভিতর হইতে সমস্ত বাসনা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, আমরা সকল সময়ে ভগবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া থাকিব, আমাদের প্রকৃতিকে, আমাদের দেহ-প্রাণ-মনকে নিমিত্ত করিয়া ভাগববত শক্তি জগতে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করিবে। এইরূপ মুক্ত পুরুষ বাহ্যতঃ অন্যান্য লোকের ন্যায় সকল প্রকার কর্ম্ম করেন, বরং তাঁহার কর্ম্ম হয় বৃহৎ, তাহাতে থাকে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগ, কারণ তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া মহতী ভগবতী শক্তি কর্ম্ম করে।

উদাসীন ভাবে যেমন-তেমন ভাবে কর্ম্ম করিলেই হইল, কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা, উপায়ের দ্বারা কিরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে না,—ইহা গীতার শিক্ষা নহে; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে কর্ম্ম করা যত সহজ হয়, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, মানবীয় ইচ্ছার অস্থির ব্যাকুলতায় কর্ম্ম করিলে সেরূপ হয় না। সেই জন্যই গীতা বলিয়াছে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্, যোগই কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল। কিন্তু এই সবই ব্যষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক মহান বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগী জানেন যে, বাহ্যতঃ যাহাই মনে হউক সমস্ত জয় পরাজয়, লাভ লোকসানে সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখনও বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার কখনও বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জ্জুনকে যে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জয় সুনিশ্চিত; কিন্তু যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ করার ভারই উপস্থিত অর্জ্জুনের উপর দেওয়া হইয়াছে।

পাতঞ্জল যোগে কর্ম্মের স্থান যেমন গৌণ, ভক্তির স্থানও সেইরূপ গৌণ। সাংখ্যে ঈশ্বরভক্তির স্থান আদৌ নাই; কারণ সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। পাতঞ্জল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকে যোগের সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অনুস্মরণ, ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্ত্তন, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন করা

ইত্যাদি। এখানে গীতার সহিত পাতঞ্জলের সাদৃশ্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা খুব গভীর নহে। পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বরে ভক্তির বিশেষ কোন স্থান নাই। পাতঞ্জল ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগেরই সামিল করিয়া ধরিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এখানে ঈশ্বরে ভক্তি যোগের একটি প্রাথমিক সহায়মাত্র ; কিন্তু ভক্তিকে, এমন কি ঈশ্বরকে বাদ দিলেও যোগেব কোন ক্ষতিই হয় না। প্রকৃত যোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান কেবল সেইরূপ একটি উপায় মাত্র,—ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ! যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি তপস্যার দ্বারা চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করাই প্রকৃত যোগ। যাহারা এইরূপ তপস্যায় ব্রতী হইতে পারে তাহাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু গীতায় ঈশ্বরই সব, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া গীতায় কোন সাধনাই নাই,—যোগ অর্থে কোন না কোন উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। এই যোগ সকল জ্ঞান, সকল তপস্যা, সকল কর্ম্মের উপরে। আবার যোগীদের মধ্যে যাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন, ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

> তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬।৪৬,৪৭

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা যোগ বলিতে পাতঞ্জল-বর্ণিত অষ্টাঙ্গ রাজযোগ বুঝে নাই। তৎকাল-প্রচলিত সাধনা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি ভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

> লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
> জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩।৩

পুরাকাল হইতে সাধনার দুইটি পথ প্রচলিত রহিয়াছে, জ্ঞানের পথ এবং কর্ম্মের পথ। জ্ঞানের পথ হইতেছে সাংখ্যদের, এবং কর্ম্মের পথ হইতেছে যোগীদের। এখানে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গীতা যোগের প্রচলিত অর্থে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, পতঞ্জলির যোগসূত্রে কর্ম্মযোগের মূল কথাগুলি যদিও রহিয়াছে, তথাপি উহা কর্ম্মযোগ নহে। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করাই পাতঞ্জলের যোগ এবং সেই যোগপ্রণালী রাজযোগ বলিয়া পরিচিত। গীতা যোগকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে নাই। গীতা প্রচলিত কর্ম্মযোগকেই যোগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ; এবং কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব পূর্ণযোগের শিক্ষা দিয়াছে।

তৎকালে সাধনার দুইটি প্রধান মার্গ প্রচলিত ছিল। একটি পথ জ্ঞানের পথ, এই পথে কর্ম্মকে অন্তরায় বলিয়াই ধরা হইত। অতএব ইহা সন্ন্যাসেরও পথ। আর একটি পথ কর্ম্মের পথ। এই মতে কর্ম্ম কখনই সাধনার অন্তরায় নহে। কর্ম্মের দ্বারাই চরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়,—কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ, এবং সিদ্ধির পরও কর্ম্ম চলিতে থাকে। এই যে জনকাদি কর্ত্তৃক আচরিত কর্ম্মযোগ ইহাই যোগশব্দে পরিচিত ছিল ; এবং গীতা এই মহান কর্ম্মযোগের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে. এই কর্ম্মযোগের সহিত সাংখ্যজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥ ৫।৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫।৫

সাংখ্যেরা চায় কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞান ; গীতা বলে কর্ম্মযোগ ঠিকভাবে আচরিত হইলে তাহার মধ্যে এই দুইই আছে। জীবনে আমি যে-সব

কর্ম্ম করি সে সব আমার নহে—প্রকৃতির ; আমি কিছুই করিতেছি না ; আমার ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু কর্ম্ম চলিতেছে, আমার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা ও প্রবৃত্তি, সে-সবই প্রকৃতির ক্রিয়া, পুরুষের নহে, আত্মার নহে,—এই ভাব অন্তরে রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান ; সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া যাহারা মনে করে যে কর্ম্মের শেষ হইয়াছে তাহারা অজ্ঞান, কর্ম্ম কখনও বন্ধ থাকে না—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কর্ম্মের মধ্যে যাহারা কর্ম্মহীনতা দেখে এবং কর্ম্মহীনতার মধ্যে যাহারা কর্ম্ম দেখিতে পায় তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভব নহে. আমি কিছু করিতেছি না, প্রকৃতিই সব করিতেছে—এইরূপ ভাবই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস ; কারণ এখানে কর্ম্ম আর আত্মার বলিয়া ভ্রম হয় না, কর্ম্ম প্রকৃতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, ইহাই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। সমুদায় কর্ম্মকে প্রকৃতির জানিয়া আত্মা যখন অহঙ্কার ও বাসনা হইতে মুক্ত হয়, তখন সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টার মধ্যেও হয় তাহার সন্ন্যাস, নৈষ্কর্ম্ম্য। এরূপ আত্মজ্ঞান যেখানে নাই সেখানে প্রকৃত সন্ন্যাস অসম্ভব ; কেবল বাহ্যিক কর্ম্ম না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা যায় না। বাহ্যিক কর্ম্ম ত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। ভিতরের ত্যাগই সন্ন্যাস। সাংখ্যদত্ত প্রকৃতিপুরুষ ভেদ-জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অসম্ভব। আবার ভ্রমের বশে বাহ্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই যে মনে করে যে সন্ন্যাসী হইয়াছি, তাহার প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করিতেছে, এইভাবে নিষ্কাম নিরহঙ্কার হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস. এবং প্রকৃত যোগ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬।১

এইরূপে গীতা সাংখ্যের জ্ঞান এবং যোগের কর্ম্ম এতদুভয়ের সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্যের জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্মযোগ সম্ভব হয় না; আবার সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা নাই, কারণ তাহা কর্ম্মহীনতারই সমান নৈষ্কর্ম্ম্য। গীতা চায় কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা করিতে; যোগ অর্থে গীতা প্রথমে কর্ম্মযোগই ধরিয়াছে, কিন্তু গীতা সাংখ্যের তত্ত্ববিশ্লেষণও গ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রথমেই বুঝাইয়া দিয়াছে যে, কর্ম্মযোগের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধই নাই —একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

কিন্তু এই সমন্বয়ে একটি প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। যে-ব্যক্তি সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে; কর্ম্ম হইল কি না হইল তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না—নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্ম করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু কর্ম্ম করিতেই হইবে এমনও ত কোন কথা নাই। তবে কেন বলা হইল যে তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর? কর্ম্মের মধ্যে থাকায় আশঙ্কা আছে যে, পুনরায় হয়ত জ্ঞান হইতে, প্রকৃত সন্ন্যাস হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে পারে। অতএব কর্ম্ম যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল, এবং যতদিন কর্ম্ম একেবারে বন্ধ না হয়, ততদিন যেটুকু না করিলে নয় কেবল ততটুকু কর্ম্ম রাখাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে ভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্মত্যাগ করিতে কেন নিষেধ করিলেন? শুধু তাহাই নহে, এমন কর্ম্ম করিতে বলিলেন যাহা অপেক্ষা ঘোর হিংসাপরায়ণ কর্ম্ম আর কিছু হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য কি? তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব?

এই প্রশ্নের সমাধানই গীতা-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং এই সমাধানের দ্বারাই গীতা কর্ম্মযোগের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে তাহা যে বন্ধনের কারণ হয় না, তাহা পাতঞ্জলও

স্বীকার করিয়াছে ; এবং ইহাই কর্ম্মযোগের ভিত্তি। পাতঞ্জল সূত্রে আছে, ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (পা ২।১২) অর্থাৎ অজ্ঞান, অহঙ্কার ও আসক্তির সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই ইহজন্মে ও পরজন্মে ফলীভূত হয়। অতএব পাতঞ্জল মতেও জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম করিতে কোন হানি নাই। তথাপি পাতঞ্জল কর্ম্মের কোন প্রয়োজন বুঝে নাই, গীতার ন্যায় কর্ম্মের উপদেশ দেয় নাই, সাংখ্যের ন্যায় সন্ন্যাস ও কর্ম্মত্যাগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের লক্ষ্য হইতেছে প্রকৃতিকে অতিক্রম করা, ত্রিগুণের অতীত হওয়া, বিবেক-খ্যাতির দ্বারা পরাবৈরাগ্য লাভ করিয়া পুরুষের নিত্য, সনাতন, অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, শান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করা ; এই-জন্য শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলে কর্ম্মের স্থান নাই, প্রাকৃতিক লীলারও কোন স্থান নাই। গীতাও ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে এবং ইহার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছে ; কিন্তু গীতা আর এক প্রকৃতির, ভগবানের পরা প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে ; এবং নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া সেই দিব্য-প্রকৃতির লীলাকে ফুটাইতে চাহিয়াছে—তাহাই দিব্য-জীবন, মদ্ভাব-মাগতাঃ, মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। অজ্ঞান প্রকৃতির খেলাকে ছাড়িয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া ভাগবতভাবে ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে দিব্য-জীবনলীলার বিকাশ করিতে হইবে—ইহাই গীতার চরম লক্ষ্য। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই দিব্য সংসার-লীলার, এই ভাগবত জীবনের সন্ধান পায় নাই—তাহারা দেখিয়াছে শুধু নীচের প্রকৃতির অধীন দুঃখ ও অশান্তিময় সংসার এবং ইহার উপরে অনন্ত, অক্ষর, পূর্ণশান্তিময় পুরুষ বা আত্মার সচেতন প্রতিষ্ঠা। তাই তাহারা সংসার ছাড়িয়া এই অক্ষর প্রতিষ্ঠা লাভ করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করি-য়াছে। গীতাও এই অক্ষরের শান্ত প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে, কিন্তু গীতা

এইখানেই থামে নাই। অক্ষরই সব নহে, শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে; অচল, অটল শান্তি ও নীরবতা ভগবানের কেবল একটা দিক। ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটা দিক আছে, ক্ষরের দিক, বিশ্বলীলার দিক। সাধারণ জীবে যে ক্ষরের খেলা তাহা অজ্ঞানের খেলা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখের খেলা। কিন্তু ভগবানের যে বিশ্ব-লীলা তাহাতে দুঃখ নাই—তাহা অখণ্ড আনন্দের লীলা, সচ্চিদানন্দের খেলা। ভগবানের সেই লীলার সাথী হওয়াই জীবের পরমা গতি। ভগবানের ভিতরের দিকে আছে অক্ষরের শান্তি, বাহিরের দিকে আছে ক্ষরের লীলা। ক্ষর অক্ষর উভয়ই একই কালে ভগবানের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আবার তিনি উভয়েরই উপরে, অতএব তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৯

—মোহ হইতে মুক্ত যে ব্যক্তি এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝিতে পারে সে সর্ব্ববিদ, তাহার আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না; এবং এই ভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সে সর্ব্বতোভাবে পুরুষোত্তমকে ভক্তি করে, ভজনা করে। সকল কর্ম্মের পরিণতি জ্ঞানে; সকল জ্ঞানের পরিণতি ভক্তিতে; জ্ঞান ও কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ভক্তি তাহাই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হওয়াই গীতার যোগ।

জীব যখন পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠারূপে থাকে অক্ষরের অচল, অটল শান্তি—তাহাই ত্যাগ বা সন্ন্যাস। আর বাহিরের দিকে থাকে সজ্ঞানে ভগবানের বিশ্বলীলার যন্ত্র হওয়া, সাথী হওয়া,—ইহাই দিব্য ভোগ বা সংসার-লীলা। জ্ঞানের দ্বারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃতিকে ক্রমশঃ শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তুলিতে

হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কর্ম্ম ক্রমশঃ নিষ্কাম ও সমত্ব-সম্পন্ন হইবে, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান ক্রমশঃ পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভক্তি ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে—তখন জীব ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিবে, ভগবানের মধ্যে বাস করিয়াই ভগবানের বিশ্বলীলার আনন্দ আস্বাদন করিবে। তখনও কর্ম্ম চলিবে, কারণ ভগবান কখনও কর্ম্ম বন্ধ করেন না,— বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। অতএব যে ভগবানের ভক্ত, ভগবানের সখা তাহারও কখনও কর্ম্মের শেষ নাই—তবে সে-কর্ম্ম আর স্বার্থের বশে, অহঙ্কারের বশে হইবে না, হৃদিস্থিত ঈশ্বরের দ্বারা সজ্ঞানে পরিচালিত হইয়া সংসারের মধ্যে, ক্ষরের মধ্যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে, ভক্তির বশে, প্রেমের বশে সেই কর্ম্ম আচরিত হইবে।

ভক্তিযোগই গীতার চরম শিক্ষা। ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় সকল যোগ, সকল সাধনারই ফল লাভ করিতে পারা যায়; এবং সকলের উপরে যাহা, স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়, ভগবানের মধ্যেই বাস করিতে পারা যায়। তাই গীতা-শিক্ষার সারাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ১৮।৬৫

—"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, তোমার সকল চেষ্টা আমার দিকে দাও, আমাকে পূজা কর—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।" কিন্তু ভগবান এই যে পূর্ণ আত্মসমর্পণকেই গুহ্যতম শিক্ষা বলিলেন, ইহা মুখের কথা নহে। আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মন প্রাণ সর্ব্বদা বাসনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে—

আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করিব? আমাদের সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল চেষ্টাকে কেমন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিব? সকল বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া আত্মসমর্পণকে পূর্ণ করিবার উপায়স্বরূপ গীতা কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছে এবং জ্ঞানকে কর্ম্মযোগেরই একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াছে। জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ ও শান্ত হয়; তখন সেই শান্ত শুদ্ধ হৃদয়ে বিমল ভক্তি ও প্রেম ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের মন বড়ই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণ বড়ই প্রবল—তাহাদিগকে শান্ত করিবার যতই চেষ্টা করা যায় ততই যেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সকলেই যে একভাবে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত ও সংযত করিতে পারিবে এমন কোন কথা নাই। সেইজন্য গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধারণ উপদেশ দিয়া তাহা ছাড়াও অতিরিক্ত সাধন-প্রণালী হিসাবে রাজযোগ-সাধনারও উপদেশ দিয়াছে। ইহাই গীতার মহত্ত্ব। গীতা কোন সাধনা, কোন পন্থাকে অবহেলা করে নাই। সকল সাধনার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত রহিয়াছে, ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে সকল সাধনা হইতেই সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চিত্ত স্থির করিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ গীতা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে তাহা পাতঞ্জল-বর্ণিত রাজ-যোগেরই অনুরূপ। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে আছে—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ৫।২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ৫।২৮

এখানে আমরা যে সাধন-প্রণালীর উপদেশ দেখিতেছি তাহা মোটেই কর্ম্মযোগ নহে, এমন কি তর্কবিচারযুক্ত জ্ঞানযোগও নহে—এখানে পাতঞ্জল-বর্ণিত রাজযোগের লক্ষণগুলি রহিয়াছে। মনের সমস্ত ক্রিয়াকে

জয় করিতে হইবে, ইহাই পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মন করিতে হইবে, ইহাই প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়গণকে, দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে টানিতে হইবে, ইহাই প্রত্যাহার। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের লয় হইবে, সমাধি লাভ হইবে, মোক্ষ হইবে। তাহা হইলে এইরূপে চক্ষু বুজিয়া নাক টিপিয়া যে সমাধি ও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাই কি গীতার চরম শিক্ষা? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পাতঞ্জলের সহিত গীতার কোন তফাৎই নাই বলিতে হইবে—শেষ পর্য্যন্ত চিত্তের লয়, কর্ম্মত্যাগ ও সংসারনিবৃত্তিরূপ মুক্তিকেই গীতারও লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু গীতা পরের শ্লোকেই এইরূপ ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা ঘুচাইয়া দিয়াছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৫।২৯

ভগবান সকল যজ্ঞকর্ম্মের ভোক্তা, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, সকল জগতের মহান ঈশ্বর—তাঁহাকে জানিয়াই শান্তিলাভ করা যায়। এখানে আবার সেই ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্ম্মযোগেরই কথা আসিয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই এই অধ্যায়ের শেষ কথা। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গীতা রাজযোগকেই চরম শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই; তবে বহির্মুখী মনকে শান্ত ও সংযত করিবার একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রণালী বলিয়া ইহার উপদেশ দিয়াছে। মনকে এইভাবে ফিরাইয়া, একাগ্র করিয়া ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ জানিয়া সর্ব্বভূতের হিত সাধনা করিতে হইবে, ঈশ্বরকে সমস্ত যজ্ঞাদির ভোক্তা জানিয়া যজ্ঞকর্ম্মাদি করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা এবং ইহা জ্ঞান ও ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত দুইটি শ্লোকে গীতা যে রাজযোগের উপদেশ দিয়াছে, সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টি এক রকম তাহারই বিশদ বর্ণনা;

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা এই রাজযোগ-প্রণালীকে কত শক্তি-শালী বলিয়া বুঝিয়াছে। কিন্তু যষ্ঠ অধ্যায়েরও শেষেব শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে. সকল সাধনা, সকল যোগের উপর হইতেছে ভক্তি-যোগ এবং তাহাই গীতার নিজস্ব শিক্ষা—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

বেদান্ত-দর্শন ও গীতা

উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া ভারতে যে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত বা উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া মহামুনি বাদরায়ণ ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে দার্শনিক বর্ণনা দিয়াছেন। বেদান্ত বলিতে মূলতঃ উপনিষদকে বুঝায়; আর বেদান্ত দর্শন বলিতে বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্ম-সূত্রকে বুঝায়। গীতা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছে,

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩।৪

এই শ্লোকের প্রথম পাদে বেদ ও উপনিষদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্কের সাহায্যে জগৎতত্ত্ব সেখানে আলোচিত হইয়াছে; ইহাই দর্শনের সংজ্ঞা, অতএব ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শন।*

গীতার উল্লিখিত শ্লোক হইতেই বুঝা যায় যে, দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে তৎকালে ব্রহ্মসূত্র প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু মহামুনি বাদ-রায়ণ এই ব্রহ্মসূত্রে কোন্ অর্থ লক্ষ্য করিয়াছেন, অথবা কোন্ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা লইয়া বহু মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত সূত্র

---

*ব্রহ্মসূত্রে ঔডুলোমী, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণের নাম যে-ভাবে উক্ত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইঁহারাও অনুরূপ বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আছে। গ্রন্থকার বহু বিচারের সার সংক্ষেপ করিয়া এক একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই সকল সূত্র এতই সংক্ষিপ্ত ও এতই অর্থবহুল যে, ইহাদের অর্থনির্ণয় ভাষ্য-টীকাদি ব্যতীত সহজে করিতে পারা যায় না। সূত্র-রচনার উদ্দেশ্য বহু বিষয় সহজে স্মৃতিপটে জাগরূক রাখা। এই সকল সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিবেন, গুরুপরম্পরায় শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে, ইহাই সূত্র-রচনার সার্থকতা। কিন্তু কালক্রমে একই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নানা ব্যাখ্যা, নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মতভেদ এত অধিক যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা আর এতদিন পরে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই বেদান্তদর্শন আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই দর্শনের সমগ্র অর্থ বুঝিতে না পারিলে ইহার মূল লক্ষ্যটি, ইহার উপদেশের সার তত্ত্বটি যাহাতে আমরা ঠিকভাবে বুঝিতে পারি সে চেষ্টা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

আচার্য্য শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া ব্রহ্মসূত্রের যে বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, আমরা যদি নির্ব্বিবাদে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আর কোন হাঙ্গামাই ছিল না। এককালে ভারতে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব খুবই বেশী ছিল, তিনি শিবের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন; তাঁহার মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভারতের ইতিহাসের গতিই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ হইতে বৈদিক ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া শঙ্করাচার্য্যই ভারতে আবার নূতন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই জন্যই হিন্দুর মনে শঙ্করের স্থান আজও এত উচ্চে। আজও বেদান্ত-দর্শন বলিতে অনেকেই শঙ্করের মত-ই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্কর বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিলেও, নিজে সম্পূর্ণভাবে উহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তিনি ব্রহ্ম ও মায়া

সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধমতের প্রভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। * বৌদ্ধগণের নিকট হইতেই শঙ্কর তাঁহার মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা এবং আজীবন সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, বিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীকর, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই শঙ্করের ব্যাখ্যার মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। নিজ অনুভূতি উপলব্ধি অনুযায়ী বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়া শঙ্কর যে কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগের মানুষকে সে আদর্শ আর আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। বেদে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের, ত্যাগের সহিত ভোগের, শান্তি ও

* গীতা জ্ঞানযোগ বলিতে সাংখ্যকেই বুঝিয়াছে, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং। "পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যের জ্ঞান-প্রণালীর প্রভাব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের ন্যায়ই নিরীশ্বরবাদী এবং অদ্বৈত-বিরোধী বৌদ্ধমত বিশ্ব শক্তির কার্য্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝোঁক দিয়াছিল। বৌদ্ধমতে এই বিশ্ব-শক্তিকে প্রকৃতি না বলিয়া 'কর্ম্ম' বলা হইয়াছে, কারণ বৌদ্ধরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বীকার করে নাই। তাহাদের মতে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বিশ্ব-শক্তির এই অনিত্যতা উপলব্ধি করাই মুক্তিলাভের পন্থা। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত বেদান্ত মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার স্থানে তদনুরূপই বৈদান্তিক মায়াবাদ প্রচার করিলেন এবং বৌদ্ধদের অসৎ, অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বাণ ও শূন্যের স্থানে তদনুরূপই অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার মধ্যে সকল লক্ষণ, সকল কর্ম্ম ও শক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ এ-সব তাহাতে কখনই বস্তুতঃ ছিল না, এ-সব কেবল মনের ভ্রান্তি মাত্র।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

নীরবতার সহিত কর্ম্মের সমন্বয়মূলক যে-আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও অধ্যাত্ম সাধনার গতি আবার সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

ব্রহ্মসূত্র রচনার পশ্চাতে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকটা সেইরূপ উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকিবে, তাহাদের পক্ষে শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব নহে। এ-বিষয়ে গীতাই আমাদের সহায়। অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের জন্য যে-সকল দার্শনিক তত্ত্ব সহায়স্বরূপ হইতে পারে, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সেইরূপই তত্ত্ব যাহা পাওয়া যায়, গীতা তাহার সারোদ্ধার করিয়াছে এবং নিজের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। গীতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, * গীতা সূত্রাকারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে রচিত না হওয়ায় তাহার অর্থ বুঝা তত কঠিন নহে; অতএব বর্ত্তমানে গীতাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকার সকলেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গীতা নিজেই বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ; বৌদ্ধযুগের অবসানের পর যখন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয় তখন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই তিনটিই বেদান্ত সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেইজন্য এই তিনটি "প্রস্থানত্রয়ী" নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতার শিক্ষার আলোকে ব্রহ্মসূত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ বুঝা যায়, এইবার আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

---

* ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌টি আগে রচিত সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

ব্রহ্ম

বাদরায়ণ-রচিত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হইতেছে.

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

যাহা চরম সত্য, Ultimate Reality, উপনিষদে তাহাকে ব্রহ্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মই পরম বস্তু, ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। বেদান্ত বলিয়াছে, সেই পরম সত্যবস্তু এক বই আর দুই নহে, একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা-সকল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অন্তর্গত। উপনিষদে ব্রহ্মকে কোথাও ঈশ্বর বলা হইয়াছে, কোথাও পুরুষ বলা হইয়াছে, কোথাও দেব বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম বলিতে এ-সকল শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। সাংখ্য পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, যোগ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়াছে; বেদান্তদর্শন সাংখ্য ও যোগের মত খণ্ডন করিয়া যেমন নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইরূপ পুরুষ ও ঈশ্বর শব্দকেও ব্রহ্মবাচক শব্দরূপে গ্রহণ করে নাই। আচার্য্য শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, ন্যায়সঙ্গত ব্রহ্মবাদে পুরুষ, ঈশ্বর বা দেবের স্থান ব্রহ্মের নীচেই হয়। কিন্তু গীতা উপনিষদকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মকেই পুরুষ ও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; গীতার মতে এই তিনটি শব্দই সমানার্থবাচক, এবং ইহা শুধু নাম লইয়াই গোলমাল নহে, নামের সহিত তত্ত্বেরও নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর এই সব শব্দ একই সদ্‌বস্তুর বিভিন্ন ভাব বা প্রতিষ্ঠা নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয় সূত্রে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,

জন্মাদস্য যতঃ

ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয়।

সাংখ্য বলিয়াছে, পুরুষ অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয়; প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সাংখ্যের এই মত নিরসন করিয়া বেদান্ত বলিতেছে,—

ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি। ইহাতে একদিকে যেমন সাংখ্যের মত নিরসন করা হইয়াছে, অন্য দিকে ব্রহ্মেরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদে নানা স্থানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্গুণ, তাঁহাকে কোনরূপ লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, কেবল "নেতি, নেতি" দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝান যায়, ব্রহ্ম "ইহা নহে, ইহা নহে"। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, দীর্ঘ, নহেন, হ্রস্ব নহেন, তাঁহার শব্দ নাই, রূপ নাই, তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই। অন্যত্র বলা হইয়াছে, তিনি বাক্যের, মনের, ইন্দ্রিয়ের অতীত। কিন্তু যখন বলা হইল, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, তখন ত "নেতি, নেতি" হইল না। তিনি ত মনের অগোচর রহিলেন না, বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা গেল! তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম এক নহে, দুই, এক ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, আর-এক ব্রহ্ম নির্দ্দেশ্য, সগুণ, এবং এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি? কিন্তু ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ছাড়া আর দুই নাই। তাহা হইলে একই বস্তুতে এইরূপ বিরোধী ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হয়? ব্রহ্মসূত্রকার ইহার সহজ উত্তর দিয়াছেন, শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ (২।১।২৭), যুক্তিতর্কের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদই ব্রহ্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে নির্গুণও বলিয়াছে, সগুণও বলিয়াছে তখন এ-সম্বন্ধে বিচার বিতর্কের স্থান নাই।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কিন্তু শুধু এইরূপ উত্তরেই সন্তুষ্ট হন নাই। শ্রুতিকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু শ্রুতি ত যুক্তিতর্ক নিষেধ করে নাই। শ্রুতিতেই রহিয়াছে,

শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ—বৃঃ উঃ ২।৪।৫

এ-স্থানে এই মননটি অনুমানাত্মক বিচার ভিন্ন আর আর কিছুই নহে। অতএব অনুমান বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অবিরোধী হইলে বেদান্ত-

বাক্যার্থ জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার জন্যই আবশ্যক হয়। আচার্য্য শঙ্কর এইরূপে মানসিক যুক্তিতর্কের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া যুক্তির দ্বারাই উল্লিখিত বিরোধের যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই,—ব্রহ্ম একই সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ হইতে পারে না. ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ; অথচ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ বলা হইয়াছে, কোথাও সগুণ বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের যে সগুণ ভাব, এটা মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মে কোন গুণ, কোন লক্ষণ, কোন বিশেষ নাই, কেবল মনবুদ্ধির অজ্ঞান বা অবিদ্যার বশেই এইরূপ মনে হয়। ব্রহ্মের সগুণ ভাব, ঈশ্বরভাব, জগৎস্রষ্টা ভাব সত্য নহে, এবং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এই জগৎও সত্য নহে, এ-সবই মায়া, যেন নিদ্রিতের স্বপ্ন দেখা।

কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে কোথাও অবিদ্যা বা মায়ার এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না, এবং জগৎকে কোথাও স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলা হয় নাই। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অবিদ্যা বা মায়া সম্বন্ধে এই ধারণা আচার্য্য শঙ্করেরই স্বকপোলকল্পিত,* সূত্রকারের মনে ইহা স্থান পায় নাই। কিন্তু তাহা হইলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সমন্বয় কেমন করিয়া হয়? সূত্রকার এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল শ্রুতির প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন,

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৮

আত্মা এক হইলেও তাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ২।১।৩০

---

*আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর নিজের আংশিক উপলব্ধি এবং বৌদ্ধগণের "অনিত্যতা" (Impermanence) হইতেই তাঁহার মায়াবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রুতিতে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বশক্তিসমান্বিত, এ জন্যও তাঁহা হইতেই এই বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ২।১।৩৭

যেহেতু ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রুতিতে উল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মই তাঁহাতে উপপন্ন হয়, সেই হেতু এই বৈদান্তিক মত সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অতীত।

ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় গীতা শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে যে, একই ব্রহ্মের মধ্যে নানা আপাতবিরোধী ভাবের সমাবেশ আছে, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, আবার নির্গুণও বটেন (গীতা ১৩।১৩-১৪)। শ্রুতির অর্থ লইয়া মানুষের মন যে বিভ্রান্ত হইতে পারে, গীতা ইহা স্বীকার করিলেও শঙ্করের ন্যায় তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে মানসিক অনুমান যুক্তির উপর নির্ভর করিতে বলে নাই। সমাধির দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিলে ভিতর হইতে যে জ্ঞানের দীপ জ্বলিয়া উঠে, জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, গীতার মতে তাহাই সত্যাসত্যের চরম প্রমাণ,

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ২।৫৩

যোগলব্ধ অন্তর্দৃষ্টির সহায়েই গীতা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সমন্বয় করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত সত্তার অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে বেদান্ত-মতানুযায়ী প্রথমে আমাদিগকে "নেতি, নেতি", "ইহা নহে, ইহা নহে" করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই প্রাণ নই, এই মন নই—যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, সংসারে আমার ভিতরে ও বাহিরে যে পরিবর্ত্তনের খেলা চলিতেছে, আমি বস্তুতঃ এই সকলের ঊর্দ্ধে অচল, অক্ষর, শান্ত, নিত্য, সনাতন, কূটস্থ, সর্ব্বব্যাপী আত্মা। এই ভাবে আমরা আমাদের মধ্যেই নামরূপের অতীত সত্তার বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই। এই

উপলব্ধি অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রথম সোপান। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর সত্তা রহিয়াছে, তাহাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রকৃতির খেলা বন্ধ হয় না।* আমাদের ভিতরে ও বাহিরে দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, কেবল আমাদের আত্মা নিজের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করিয়া সাক্ষীস্বরূপ, উদাসীনবৎ, সেই সব ক্রিয়াকে দেখিতে থাকে, তাহাদের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলে না। আর এইভাবে দেখিলেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। যতক্ষণ আমরা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করি, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অহংকে, কাঁচা "আমি"কেই আমাদের সব বলিয়া মনে করি, ততক্ষণ এই জীবন ও জগৎ দ্বন্দ্ব মোহের খেলা, সুখ দুঃখের খেলা বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়,—গীতার মতে ইহাই অজ্ঞান, মায়া। কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তায়, আমাদের পাকা "আমি"তে প্রতিষ্ঠিত হই, দেখি যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী যে এক, অক্ষর, অচল, নামরূপের অতীত, নির্ব্যক্তিক (impersonal) আত্মা রহিয়াছে, আমি বস্তুতঃ তাহাই, "তত্ত্বমসি", "সোঽহং", তখন সমস্ত দ্বন্দ্ব মোহ দূর হইয়া যায়, সর্ব্বত্র ঐক্য, শান্তি ও আনন্দের লীলা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রকৃতি তখন তাহার নিজের দিব্য স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মারই শক্তি, আত্মা শুধু উপদ্রষ্টা নহে,

---

* জগৎ যদি শঙ্করমতানুযায়ী মিথ্যা মায়া মাত্র হইত, তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই সেই মায়া দূর হইয়া যাইত, জগৎ লোপ পাইত, শরীর, প্রাণ, মন সব লোপ পাইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও দেহ থাকে, জীবন থাকে—সেই অবস্থাকে ব্রহ্মসূত্রে জীবন্মুক্তি বলা হইয়াছে।

সাক্ষীমাত্র নহে, আত্মাই ঈশ্বর; প্রকৃতি নিজ প্রভুর আনন্দের জন্য, ভোগের জন্য এই অনন্ত আশ্চর্য্যময় বিশ্বলীলার বিকাশ করিতেছে। সেই প্রভুই অচল অক্ষর আত্মারূপে জগজ্জননীর এই লীলাকে দর্শন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছেন, আবার তিনিই ঈশ্বররূপে এই প্রকৃতির সমগ্র লীলাকে পরিচালিত করিতেছেন, উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

ইহাই গীতার সমন্বয়। ব্রহ্ম নির্গুণও বটেন, সগুণও বটেন, ক্ষরও বটেন, অক্ষরও বটেন। ক্ষররূপে সগুণভাবে নিজ প্রকৃতিকে ধরিয়া বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, জন্মাদস্য যতঃ, আবার অক্ষররূপে নির্গুণ-ভাবে প্রকৃতির লীলা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া সেই লীলাকে ধরিয়া বিশ্বে রহিয়াছেন, দর্শন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু সে-লীলার মধ্যে মগ্ন হন নাই। ক্ষর ও অক্ষর, সগুণ ও নির্গুণ তাঁহার দুইটি ভাব, aspects, একই সঙ্গে তাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে; আবার তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, জগতের অতীত, বিশ্বাতীত (transcendent), অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য। তিনি ক্ষর পুরুষেরও উর্দ্ধে, অক্ষর পুরুষেরও উর্দ্ধে, তাই তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। এই পুরুষোত্তমই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।

জীব

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে জীবতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, জন্ম মৃত্যু এ-সব জীবের নহে, দেহেরই জন্ম মৃত্যু হয়।

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ॥ ২।৩।১৭

জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, কারণ শ্রুতি তাহার উৎপত্তি থাকা বলে

নাই, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" * ইত্যাদি কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব এবং অজত্ব কথিত হইয়াছে। এই পাদের ১৯ সূত্রে বলা হইয়াছে,

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্।

শ্রুতি জীব সম্বন্ধে উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ হইতে প্রয়াণ, গতি অর্থাৎ পরলোকে গমন ও আগতি অর্থাৎ পরলোক হইতে পুনরায় আগমনের কথা বলিয়াছে। তাহা হইলে জীব বিভু বা সর্ব্বব্যাপী নহে, জীব অণুপরিমাণ। জীব হৃদ্দেশে বাস করে, কিন্তু গন্ধ দ্রব্য একস্থলে থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই জীবের চৈতন্যও সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়। জীব যখন এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যায়, তখন এই চৈতন্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

গীতাতে আমরা জীবের এইরূপ বর্ণনাই পাই। শ্রুতিও জীবকে অণুপরিমাণ বলিয়াছে। তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়। কারণ ব্রহ্ম অণুপরিমাণ নহে, কোন এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহে, ব্রহ্ম বিভু বা সর্ব্বব্যাপী, তাহার গমনাগমন সম্ভব হয় না। কিন্তু জীব যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম কেমন করিয়া হয়? শ্রুতিতে জীবকে "তত্ত্বমসি"ই বা বলা হইয়াছে কেন?

সূত্রকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মের অংশ,

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—২।৩।৪৩

শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, অভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব জীব ও ব্রহ্মে অংশ ও অংশী এই সম্বন্ধ। অংশ অংশীর সহিত অনন্য,

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ—২।১।১৪

কিন্তু ইহাতেই ত বিরোধের মীমাংসা হয় না। শ্রুতি বলিয়াছে, ব্রহ্ম

* গীতা—২।২০

নিরবয়ব নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ; জড় বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মকে নানাভাবে বিভক্ত করা যায় না। তাহা হইলে ব্রহ্মের অংশ কেমন করিয়া হইতে পারে ? বাদরায়ণের পক্ষে ইহার উত্তর খুবই সহজ, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। শ্রুতি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্ম নিরবয়ব, আবার শ্রুতি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় জীব ব্রহ্মের অংশ, অতএব এখানে তর্কের কোন স্থান নাই।

শঙ্কর কিন্তু তর্কের দ্বারাই এই বিরোধের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রুতির মতে জীব নিত্য, উৎপত্তিরহিত, অতএব জীব এবং ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। জীবের অণুত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, অংশত্ব, কর্তৃত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু এ-সব সত্য নহে, এ-সব মায়া বা অবিদ্যার কার্য্য। জীব অজ্ঞানের বশেই আপনাকে ক্ষুদ্র, অংশ-পরিমাণ মনে করে। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলেই জীব বুঝিবে যে, তাহাতে আর ব্রহ্মে কোনই ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু এইরূপে জীবের অংশত্ব, অণুত্ব, ও কর্তৃত্বকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন সমর্থন ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। শঙ্কর বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব মিথ্যা ভ্রম মাত্র। ব্রহ্মসূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন,

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ—২।৩।৪১

সূত্রকারের মতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও তেমনই ব্রহ্মের অংশ, স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি অনন্য হইলেও ভেদ রহিয়াছে। ফেন, তরঙ্গ এ-সব সমুদ্রের অংশ হইলেও ফেন তরঙ্গই সমুদ্র নহে। তেমনই জীব ব্রহ্মের অংশ কিন্তু ব্রহ্ম নহে। তবে জীবের যে বিভুত্বের কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, জীব জ্ঞানলাভ করিলে ব্রহ্মভাব বা বিভুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্মের

সহিত এক বলা হইয়াছে, তত্ত্বমসি। শিশুর মধ্যে পুংস্ত্ব যেমন সম্ভাবনা-রূপে নিহিত থাকে, জীবের মধ্যেও ব্রহ্মত্ব সেইভাবে নিহিত রহিয়াছে

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ—২।৩।৩১

অতএব বাদরায়ণের মতে জীবই ব্রহ্ম নহে কিন্তু জীবের মধ্যে ব্রহ্মভাব বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা তাহার বিকাশ হয়, জীব বিভুত্ব ব্রহ্মত্ব লাভ করে, তখন সে চিরকাল সেই ব্রহ্মত্ব ভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৮ এবং ৪৭ সূত্রে বলা হইয়াছে, যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের সহিত অনন্য, তথাপি জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে বলিয়া ব্রহ্ম সুখ দুঃখ ভোগ করে না। জীব ব্রহ্মের সহিত অনন্য হইলেও ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক,

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ—২।১।২১

জীবই নিজের কর্ম্মের দ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করে, কিন্তু সে-সব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না! অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাদরায়ণের মতে জীব ব্রহ্মের সহিত ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। কিন্তু এইরূপ ভেদাভেদ এক সঙ্গে কিরূপে সম্ভব হয়? বাদরায়ণ বলিয়াছেন, শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। শঙ্কর বলিয়াছেন, অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা মায়া।

এইবার গীতা এই বিরোধের মীমাংসা কি ভাবে করিয়াছে তাহা দেখা যাউক। গীতা ব্রহ্ম বা আত্মাকে নিত্য, স্থাণু, নিরবয়ব, সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, অতএব ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা যায় না। অথচ, গীতা ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছে, মমৈবাংশঃ। গীতা জীবকে সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত মূলতঃ প্রভেদ করে নাই। জীব যতক্ষণ অহঙ্কার ও অজ্ঞানের অধীন ততক্ষণই সে আপ-নাকে ক্ষুদ্র "আমি" বলিয়া মনে করে, কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান হয় তখন সে জানিতে পারে যে, তাহার আত্মা এবং সর্ব্বগত ব্রহ্ম একই

বস্তু, তখন সে ব্রহ্মই হয়, ব্রহ্মভূতঃ। এ পর্য্যন্ত গীতার মতের সহিত শঙ্করের মতের বেশ মিল আছে। কিন্তু জীবের ব্যষ্টিস্বরূপকে শঙ্কর মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা বলিয়াছেন, গীতা কোথাও তাহা বলে নাই। অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে যে-ভাবে দেখে তাহা মিথ্যা, কিন্তু তাই বলিয়া জীবের ব্যক্তিত্ব বা ব্যষ্টিস্বরূপ মিথ্যা নহে, পরা প্রকৃতির মধ্যে জীবের দিব্য ব্যষ্টিস্বরূপ রহিয়াছে, অজ্ঞানের মধ্যে তাহার অহংভাব সেই দিব্য ব্যষ্টিত্বেরই বিকৃত ছায়ামাত্র।

তাহা হইলে গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে জীব তাহার অন্তরতম সত্তায় ভগবানের সহিত এক, ব্রহ্মের সহিত এক, অভেদ। কিন্তু প্রকৃতিতে জীব পরা প্রকৃতির অংশমাত্র। ভগবানের পরা প্রকৃতিই প্রত্যেক জীবের স্বভাব হইয়াছে, জীবভূতা, এবং সেই স্বভাবের বিকাশই প্রত্যেক জীবের জীবনলীলা। জীব যতক্ষণ না তাহার এই নিগূঢ় স্বভাবেব সন্ধান পায়, তাহার নীচের বিকৃত প্রকৃতিতে, ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণই তাহার অজ্ঞান, অহংভাব, বাসনা, দ্বন্দ্ব, দুঃখের খেলা চলিতে থাকে। এই নীচের খেলা ছাড়াইয়া উঠিলেই তাহার মধ্যে স্বভাবের খেলা, পরা প্রকৃতির খেলার বিকাশ হয়, তখন আত্মাতে সে ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে, আর প্রকৃতিতে ভগবদ্‌লীলার শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত আধার হয়। গীতার মতে ইহাই জীবের পরমা গতি। মম সাধর্ম্ম্যমাগতঃ, ময্যেব নিবসিষ্যসি, মদ্‌ভাবমাগতাঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা গীতা এই দিব্যজীবনই নির্দ্দেশ করিয়াছে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে আবির্ভূত হয় (১৫।৭); ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বাবা ভগবানের প্রকাশ বস্তুতঃ যতই আংশিক হউক না কেন। আর "সনাতন" বিশেষণটির দ্বারা বুঝায় যে, বহুজীবের প্রত্যেক জীবই

হইতেছে এক একটি শাশ্বত ব্যক্তি. একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার এক একটি শাশ্বত, অজাত, অমৃত শক্তি। ব্যষ্টিগত জীব উৰ্দ্ধে শাশ্বতের মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল কারণ উহা নিজে সনাতন। এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা কোথাও বলে নাই যাহা হইতে আদৌ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, পরন্তু গীতা বলিয়াছে, জীবের পক্ষে পরম পদ হইতেছে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করা, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতা যখন সর্ব্বভূতের এক আত্মার কথা বলিতেছে তখন মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদের ভাষা ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু আবার এই যে বলা হইতেছে—ব্যষ্টিগত জীব সনাতন, ইহাতে একটা "বিশেষ" আসিয়া পড়িতেছে এবং মনে হয় গীতা প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকার করিতেছে। ইহা হইতেই একেবারে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব, অথবা ইহা পরবর্ত্তী রামানুজ মতের সহিত এক। তথাপি এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয় ভাগবত সত্তার মধ্যেই একটি বহুত্বের তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু মায়া নহে, তাহা শাশ্বত সত্য। এই সনাতন জীব ভাগবত পুরুষ হইতে অন্য কিছু নহে অথবা তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথকও নহে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার একত্বের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বহুত্বের দ্বারা আমাদের মধ্যে অমর আত্মারূপে চিরবিরাজমান রহিয়াছেন।

রামানুজের মতের সহিত গীতার মতের মূল প্রভেদ এই যে, তিনি ভগবানের সহিত জীবের পার্থক্য কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চিৎস্বরূপ জীব নিত্যই ঈশ্বর হইতে পৃথক। মুক্তিলাভে সে কেবল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, ব্রহ্ম হইয়া যায় না। এই সাধনায় কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচার আবশ্যক বটে, কিন্তু ধ্রুবা স্মৃতি বা ভক্তিই প্রধান উপায়। কিন্তু গীতার মতে প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই,

প্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুতঃ যতই আংশিক হউক না কেন। রামানুজের মত সাংখ্যমতেরই প্রকারভেদ, সাংখ্যের বহু চেতন পুরুষই রামানুজের বহু জীব, সাংখ্যের ন্যায়ই রামামনুজ বলিয়াছেন, প্রকৃতি বস্তুতঃ জড়, অচিৎ। সাংখ্যের সহিত তাঁহার প্রভেদ কেবল এই যে, তিনি জীব ও প্রকৃতির অতিরিক্ত ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই সব জীব ও জড়জগৎ এক ঈশ্বরের মধ্যেই রহিয়াছে, এই সব হইতেছে তাঁহার শরীর, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তিনি এই সবের আত্মাস্বরূপ। অচিৎ-জড় ভোগ্য, চিৎ-জীব ভোক্তা, আর তৎসমুদয়ের পরিচালক ঈশ্বর, এই তিন লইয়াই ব্রহ্ম। চেতন ও অচেতন পদার্থ-সমূহ যখন ব্রহ্মের শরীর তখন এই গুলি তাঁহার ধর্ম্ম বলিতে হইবে। কাজেই এই পরমব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সকল গুণের আকর। শাস্ত্রে যে পরমাত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে. উহা হেয় গুণের অসদ্ভাব নিবন্ধন, কিন্তু সত্যসঙ্কল্প, সত্যকাম প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসকলের নিষেধ করা হয় নাই। সেই কল্যাণময় গুণসকল অসীম, অনন্ত, জীবের পক্ষে অপরিমেয়, এই সকল কারণেই তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ পরমাত্মা নির্গুণ নহেন। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, এই সকলের ধর্ম্ম পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। ইহা দ্বারা স্বগত বিশেষ বিশেষ ভেদযুক্ত একমাত্র ব্রহ্মই রহিয়াছেন, ইহাই সপ্রমাণিত হয়। রামানুজের এই মতই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাত। জীব ব্রহ্মের শরীর তাই তাহাকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ জীব কখনই ব্রহ্ম বা ভগবান নহে, যেমন হস্ত পদ মানুষের অংশ হইলেও মানুষ নহে। মধ্বচার্য্য আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ ভগবানের শরীরও নহে, উহারা ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পৃথক বস্তু, তবে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপরই নির্ভরশীল। জীবকে যে

ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে সেটা কেবল একটা উপমা মাত্র, সমগ্রের সহিত অংশের যেমন সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ সেইরূপ অর্থাৎ ভগবানের সহিত জীবের কিছু সাদৃশ্য আছে এবং জীব সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের অধীন। মধ্বাচার্য্যের এই মত দ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাত।

বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যে গীতার মত নহে আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। গীতার মতে জীব ভগবান হইতে বস্তুতঃ পৃথক নহে। ভগবান এক, তিনিই বহু রূপ গ্রহণ করিয়া জীব হইয়াছেন। তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যে যেমন একত্ব রহিয়াছে, তেমনি বহুত্ব রহিয়াছে, সেই বহুত্বের দ্বারাই তিনি জীবলোকে জীবাত্মারূপে আবির্ভূত হইতেছেন, প্রকৃতি হইতে শরীর গ্রহণ করিতেছেন, যখন সেই দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিতেছেন তখন পঞ্চভূতের দেহ আবার পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে (গীতা ১৫।৭,৮)। আর এই প্রকৃতিও মূলতঃ জড় বা অচিৎ নহে। সাংখ্য, রামানুজ বা মধ্বাচার্য্য যে প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন তাহা হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, গীতার অপরা প্রকৃতি। কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকৃতির নীচের রূপ, গীতা ইহার উপরে আর এক প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে, তাহা হইতেছে পরমা চিৎ শক্তি, পরাপ্রকৃতি। বস্তুতঃ জগতে জড় বা অচিৎ বলিয়া কিছুই নাই, সবই চৈতন্যময়, সবই বাসুদেব। আপাততঃ যাহাকে জড় বলিয়া দেখা যায় তাহার মধ্যেও চৈতন্য সুপ্ত রহিয়াছে, প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে। এই ভাবেই তথাকথিত জড়প্রকৃতি হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ হইয়াছে, জড়জগতে ক্রমশঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই প্রকট হইতেছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদই সত্য, রামানুজ ও মধ্বের মতে ভেদই সত্য। আচার্য্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন ভেদ ও অভেদ

উভয়ই সত্য ; তাঁহার মতে জীব, জগৎ এ-সবই হইতেছে ব্রহ্মের বা ভগবানের শক্তি, অংশো হি শক্তিরূপো গ্রাহ্যঃ। আগুন এবং আগুনের দাহিকা শক্তি এক নহে অতএব এখানে দ্বৈতভাব রহিয়াছে, আবার আগুন ছাড়া দাহিকা শক্তির কোন সত্তাই নাই অতএব এখানে অদ্বৈত রহিয়াছে। এইজন্য এই মতকে দ্বৈতাদ্বৈত মীমাংসা বলা হয়। শক্তি-মানের সহিত শক্তির ভেদও অচিন্ত্য এবং অভেদও অচিন্ত্য—এইজন্য এই মতকে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও বলা হয়। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই ছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এইটিই ঠিক গীতার সিদ্ধান্ত, কারণ গীতা ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করিয়াছে। গীতা ভগবান এবং তাঁহার পরমা চিৎ শক্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার করে নাই। গীতার তিন পুরুষ হইতেছে একই ভগবানের তিন স্থিতি বা status : আর গীতার দুই প্রকৃতি হইতেছে একই চিৎ শক্তির দুইটি রূপ, পরা ও অপরা। ভগবান বলিয়াছেন, "আমার প্রকৃতি", ইহাতে ভগবানের সহিত প্রকৃতির ভেদ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে, এতদ্‌যোনীনি ভূতানি, এই পরা প্রকৃতিই হইতেছে সর্ব্বভূতের যোনি। আবার ঐ শ্লোকেরই দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে,

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা,

—"আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি-স্থল, আবার আমাতেই উহার লয় হয়। আমা অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই নাই।" অতএব এখানে পরম পুরুষ পুরুষোত্তম এবং পরমা প্রকৃতি পরা প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে। এখান হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা একই অদ্বিতীয় সত্যের কেবল দুইটা দেখিবার ভঙ্গী মাত্র—কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন, "আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও স্থান", তাঁহার পরা প্রকৃতিই যে এই

দুই স্থান তাহা খুবই স্পষ্ট। ভগবান তাঁহার অনন্ত চৈতন্য স্বরূপেই ব্রহ্ম, এবং পরা প্রকৃতি হইতেছে সেই অনন্ত চৈতন্যেরই অন্তর্নিহিত দিব্য ইচ্ছাশক্তি, দিব্য কর্ম্মশক্তি।

তথাপি দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদ বলিয়া যে-মত প্রচলিত তাহার সহিত গীতার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ মতে অভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে,

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীব ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ?
গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?

অন্যত্র বলা হইয়াছে,

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।

বস্তুতঃ নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য যত পার্থক্যই থাকুক, ভগবানের সহিত জীবের ভেদ সম্বন্ধটিই হইতেছে তাহাদের সাধারণ ভিত্তি,—এক পুরুষ ভগবান, আর সব জীব তাঁহারই শক্তি ; জীব ভগবানের সেবা করিবে, ভগবানকে ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, ইহাই জীবের সাধনা এবং ইহাই তাহার সিদ্ধি। গীতাও প্রেম ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা অভেদ ও একত্ব উপলব্ধির উপর,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে জীবকে শক্তি বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা গীতার মত নহে। গীতার মতে জীবের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই রহিয়াছে, পুরুষ হিসাবে জীব ভগবানের সহিত এক, প্রকৃতি হিসাবে সে পরা প্রকৃতির অংশ বা আংশিক প্রকাশ। গীতার এই পরা প্রকৃতির

তত্ত্বটি লইয়াই গোলমাল হইয়াছে। বৈষ্ণব মতে জীবই পরা প্রকৃতি, আর ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিই হইতেছে এই জগতের মূল। কিন্তু গীতার মতে পরা প্রকৃতিই জীব নহে, পরা প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতা : পরা প্রকৃতি হইতেছে জীব হইতে উচ্চতর সত্য। জীব ও জগৎ উভয়েই পরা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত,

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

সাংখ্যের ন্যায় ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবগণও জগৎকে দুঃখময় বলিয়া দেখিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠ, গোলক বা আধ্যাত্মিক বৃন্দাবনে পরম প্রেমাস্পদ ভগবানের সহিত পূর্ণ মিলনের জন্য এই সংসার ও পার্থিব জীবনকে পরিত্যাগ করা ও সন্ন্যাস অবলম্বন করাকেই অপরিহার্য্য চরম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতা সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উপরে যে সচ্চিদানন্দময়ী পরা প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়াছে, এইটিই হইতেছে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে গীতার প্রথম মৌলিক সিদ্ধান্ত, এবং এইটিকে ধরিতে না পারিলে গীতার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের রহস্য বুঝা যায় না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যও গীতার পরা প্রকৃতির রহস্যটি ধরিতে পারেন নাই। জগতের মূলে এই যে ভাগবতী চিৎশক্তি রহিয়াছে, ইহাকে স্বীকার করিলে আর এই জগৎকে মিথ্যা বলা চলে না, তাই শঙ্কর এই পরা প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, কূট ব্যাখ্যার দ্বারা ইহার অস্তিত্বই উড়াইয়া দিয়াছেন। শঙ্করের মতে আছে কেবল দুইটি অনাদি তত্ত্ব, সৎ ব্রহ্ম এবং সদসৎ মায়াশক্তি। গীতা যেখানে পরা প্রকৃতির কথা বলিয়াছে, শঙ্কর সেখানে পরা প্রকৃতি বলিতে বুঝিয়াছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গীতা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে প্রকৃতি বুঝে নাই, পরন্তু

পুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ করিয়া পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়াছে, অতএব শঙ্কর এখানে ঠিক উল্টা বুঝিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, শঙ্কর অক্ষর পুরুষকে বলিয়াছেন মায়াশক্তি, আবার সপ্তম অধ্যায়ে অপরা প্রকৃতিকেই বলিয়াছেন মায়া, অতএব তিনি কোথাও পুরুষকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, কোথাও প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়াছেন। আবার কোথাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি, প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ঈশ্বরস্য প্রকৃতি (১৩।১৯ ভাষ্য), দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য (১৩।১ ভাষ্য)। গীতা বিশেষ বিশেষ অর্থ লইয়া যে-সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এইরূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াই শঙ্কর গীতা হইতে তাঁহার মায়াবাদের সমর্থন বাহির করিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতার অর্থে কোথাও এইরূপ গোলমাল নাই, গীতার দার্শনিক তত্ত্ব সুস্পষ্ট, নিজেদের সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনের জন্য গীতার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিলে গীতার এই উদার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

উপসংহার

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া যে-সব মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ, নিম্বার্কের ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) বাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ। শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতে এই সব মত লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়াছে তাহা মানবীয় বুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারশক্তির চরম নিদর্শন। ইঁহারা সকলেই গীতাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, গীতার ব্যাখ্যার দ্বারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা কোন বিশেষ সম্প্রদায়েরই গ্রন্থ নহে। বস্তুতঃ গীতাতে যে উদার সমন্বয়মূলক সমগ্র সত্য বিবৃত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন উপলব্ধি মত তাহারই এক একটি দিকের উপর জোর দিয়াছেন। আজও ভারতে এই সব সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিয়া আপন আপন মতানুযায়ী সাধন প্রণালীর অনুসরণ করিতেছেন এবং আপন আপন মতবাদের প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমানে শঙ্করের মায়াবাদ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ কর্ত্তৃকই দেশবিদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছে। অন্যপক্ষে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থে এই মতের দোষগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেমন রামানুজ ব্রহ্মের মধ্যে অচিৎ তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদকে ক্ষুণ্ন করিয়াছেন, তেমনই শঙ্কর সৎ ব্রহ্মের মধ্যে সদসৎ মায়াশক্তির কল্পনা করিয়া অদ্বৈতবাদকে ক্ষুণ্ন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আচার্য্য শঙ্করের মতে অবিদ্যার নাশ হয়, এরূপ স্বীকার থাকায় উহা বিজ্ঞান ও শ্রুতি, উভয়

বিরুদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু অবিদ্যার জগৎ-কারণত্ব দেখাইয়া এবং সেই অবিদ্যার বিনাশ স্বীকার করিয়া আচার্য্য অসতর্কে বৌদ্ধবাদে উপনীত হইয়াছেন, এবং সাংখ্য-বিভাগের গণ্ডি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।" একমাত্র অবাঙ্‌মনসগোচর চিৎরসৈকঘন পরমাত্মাই আছেন এবং তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ জগতের কারণ,—ইহাই শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের মতে যথার্থ সর্ব্বভেদাতীত অবাধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সার উপদেশ।

বেদান্তের উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহে নানা বৈষম্য থাকিলেও একটি বিষয়ে সকলের মিল রহিয়াছে এবং সেইটিই হইতেছে কার্য্যতঃ মুখ্য বিষয়। এই জগৎ ভগবানের সত্য সৃষ্টিই হউক বা মায়ার সৃষ্টিই হউক, সকলেরই মতে এখানে জীবের জন্মগ্রহণ হইতেছে বন্ধন, তাহার পরমাবস্থা হইতে পতন, এবং এই জীবনলীলা বর্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াই হইতেছে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য। শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জীবত্বের পরম নির্ব্বাণই শিবত্বের পরম প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মবাদের লক্ষ্যই এই পরম নির্ব্বাণ বা মহামুক্তি।" "সেখানে শুধু নির্ব্বাণের আবাহন, শুধু নীরবে নিস্পন্দে নিঃশেষে নির্ধূম নির্ব্বাপণ। পূজান্তে প্রতিমা নিরঞ্জনের মত জীবত্বের সেথা নিরঞ্জন। ইহাই চরম গতি—ইহাই মহামুক্তি, কর্ম্মময় জীব-জীবনের ইহাই শেষ সীমা।" কিন্তু তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে শঙ্করের মায়াবাদই ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়,—এই সংসার মিথ্যা, এতএব এই মিথ্যার অবসান করাই জীবের পরম গতি। বস্তুতঃ এই লক্ষ্যটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, জগৎ ও জীবনলীলা ছাড়াইয়া ইহার ঊর্দ্ধে পরম পদ লাভ করিতে হইবে। সেই পরম পদ কি এবং কেমন করিয়া তাহা লাভ করা যায় তাহা লইয়াই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ। শঙ্কর বলিয়াছেন জ্ঞানই পন্থা, রামানুজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন

ভক্তিই পন্থা, বিজয়কৃষ্ণের মতে সেই পরম নির্ব্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়।

কিন্তু গীতা এই লক্ষ্যটি গ্রহণ করে নাই এবং ইহাই হইতেছে বৈদান্তিক গ্রন্থ হিসাবে গীতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবত্বের চরম নির্ব্বাণের কথা গীতা কোথাও বলে নাই, গীতা শুধু বলিয়াছে ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ এবং তাঁহার মধ্যে বাস করিবার কথা। গীতার মতে জীবের পক্ষে ইহাই হইতেছে পরম পদ। আর গীতা ঝোঁক দিয়াছে ইহজীবনের উপর, ইহৈব। মানুষকে তাহার পরম পদ লাভ করিতে হইলে এই জীবনলীলা ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, এই পৃথিবীতে, এই জড়দেহে, প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ তাহা লাভ করিতে হইবে ; এবং যতদিন না মানুষ সেই সিদ্ধিলাভ করিতেছে ততদিন সে যত উচ্চলোকেই যাউক না কেন তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে,

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬

এই সংসার অনিত্য দুঃখময়, এই দুঃখময় সংসারে পুনঃ পুনঃ বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করা বন্ধ করিতে হইবে, এই সব প্রচলিত মতকে গীতা অগ্রাহ্য করে নাই। গীতার পদ্ধতিই এই, প্রচলিত প্রথা ও ধারণা-সকলকে লইয়া তাহাদের নিগূঢ় অর্থ ও উপযোগিতা দেখাইয়া দেওয়া। লোকে যে সংসারের দুঃখ হইতে মুক্তি চায় গীতোক্ত সাধনার দ্বারা তাহা সম্যকভাবেই লাভ করা যায়, আর এই সাধনা দ্বারা যাহারা ভাগবতভাব লাভ করে তাহাদিগকে আর অজ্ঞান জীবের ন্যায় বাধ্য হইয়া, অবশাৎ, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য এই সংসার ও জীবনলীলা ছাড়িয়া পুরুষ বা ব্রহ্মে লীন হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই ! ভিতরে যদি অক্ষর পুরুষের সাম্যে

প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তাহা হইলে এই সংসারে থাকিয়াই সৃষ্টিকে, প্রকৃতিকে জয় করা যায়,

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

ব্রহ্মে নির্ব্বাণই যদি জীবের চরম লক্ষ্য হয় তাহা হইলেও তৎপূর্ব্বে তাহাকে ভাগবত-জীবন রূপ সংসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, নতুবা জীব-সৃষ্টির নিগূঢ় লক্ষ্যই ব্যর্থ হইবে।

এই সংসিদ্ধির প্রকৃত স্বরূপটি গীতা কোথাও বিশদভাবে পরিস্ফুট করে নাই, কেবল কতকগুলি কথায় তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে। যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ গীতাশিক্ষার উপলক্ষ্য তাহার উদ্দেশ্য ছিল ,এই পৃথিবীতেই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের শেষ আজ্ঞা,

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

"অতএব উঠ, যশ লাভ কর, শত্রুকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য জয় কর।" এই সমৃদ্ধি শুধু বাহ্য সমৃদ্ধি নহে, অন্তরের অধ্যাত্ম সমৃদ্ধি, দিব্য জীবন, Kingdom of Heaven। মানুষকে মর্ত্ত্যে এই দিব্য অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ করিতে হইবে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত বিরুদ্ধ শক্তি-সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে, গীতার মতে ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য।

এই জীবনকে ছাড়িয়া যাইবার প্রেরণা, শূন্যে বা ব্রহ্মে লীন হইবার প্রেরণা যে সত্য নহে, আধুনিক যুগের মানুষ তাহা অতি তীব্র ও গভীরভাবে অনুভব করিতেছে, তাই তাহারা মুক্তি ও পরলোক-বাদকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতেছে এবং সেই জন্যই ধর্ম্মের শিক্ষা হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছে। গীতার অর্থ ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা দেখিব যে, গীতা এই মনোভাবেরই সমর্থন করিয়াছে, অর্জ্জুনের সংসারবৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রেরণাকে তীব্রভাবে নিন্দা

করিয়াই গীতাশিক্ষার আরম্ভ এবং এই পৃথিবীকে ভোগ করিবার কথা বলিয়াই সেই শিক্ষার শেষ, ভোক্ষ্যসে মহীম্। আমাদের এই যে বর্ত্তমান মানব-জীবন, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ, শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে পূর্ণ, ইহা অবিদ্যার খেলা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবিদ্যা ভগবদ্-বিরোধী কোন শক্তি নহে, জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে ইহারও স্থান আছে, উপযোগিতা আছে। ভগবানের পরমা চিৎশক্তি বা পরা প্রকৃতি যে আশ্চর্য্যময় জগৎনাট্যের অভিনয় করিতেছেন, এই অবিদ্যা বা অপরা-প্রকৃতি তাহারই একটি যন্ত্রবৎ কৌশল, a mechanical device. এই পার্থক্যটি ধরিতে না পারাতেই মায়াবাদ এবং জগৎ হইতে মুক্তির আধ্যাত্মিক প্রয়াস উদ্ভূত হইয়াছে। পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তাঁহার পরা প্রকৃতির দ্বারা নিজের মধ্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেই জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে পার্থিব অবস্থানিচয়ের মধ্যে ভাগবত জীবনের আধার স্বরূপ দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিতেছেন। ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বম্, এই সবই হইতেছে ভগবানের বাসের জন্য। তাহা হইলে এই যে দেহের জীবন ভগবানেরই বাসের জন্য অভিপ্রেত সেইটিকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা কেন ?

জীবকে গভীরতম অজ্ঞান ও অন্ধকারের মধ্যে নামিতে হইয়াছে, ভগবান হইতে যতদূর সম্ভব দূরে যাইতে হইয়াছে, যেন পুনর্মিলনের প্রয়াস ও আনন্দ হয় অভূতপূর্ব্ব ও অপরিমেয়। আর এই যে বিচ্ছেদ, জড় শরীরই হইতেছে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী উপায়স্বরূপ, এই জড় দেহের ভিতর দিয়াই পুনর্মিলনকে পূর্ণ করিতে হইবে, তবেই এই জগৎ-সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যতদিন না এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে ততদিন জীব দেহের জীবনকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, পুনঃ পুনঃ তাহাকে দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সে নিজে যে সঙ্কল্প লইয়া এই মহান প্রেমাভিসারে বহির্গত হইয়াছে তাহার সেই

সঙ্কল্পই তাহাকে এই জগৎলীলায় বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ঐকান্তিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে ছাড়িতেই হইবে এবং জন্ম একটা বন্ধন এই ভ্রান্তি দূর করিতেই হইবে, *

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ঈশা ১১

জীবের প্রগতিশীল আত্মবিকাশে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই উপযোগিতা আছে, উভয়ের সাহায্যেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে।

আদর্শ ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুন তাঁহার জীবনের পরম সন্ধিক্ষণে কঠিনতম কর্ম্মসমস্যায় পতিত হইয়া দিব্য গুরু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহার প্রিয় সখা ও শিষ্যকে যে দিব্য বাণী শুনাইয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাহার সারমর্ম্ম এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন—"কর্ম্মের রহস্য এবং সমস্ত জীবন ও সংসারের রহস্য একই। এই সংসার প্রকৃতির কেবল একটা যন্ত্র মাত্র নহে, এমন একটা নিয়মের চক্র নহে যাহার মধ্যে জীব ক্ষণিকের জন্য অথবা যুগযুগান্তের জন্য বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা হইতেছে ভগবানের নিত্য প্রকটন। জীবন শুধু জীবনের জন্যই নহে, পরন্তু ভগবানের জন্য, আর মানুষের জীবাত্মা হইতেছে ভগবানেরই একটি সনাতন অংশ। কর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে আত্ম-সন্ধান, আত্ম-বিকাশ, আত্ম-সংসিদ্ধি; বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কর্ম্মের নিজের যে-সব বাহ্য ও দৃশ্য ফল, শুধু সেই সবই কর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য নহে। অধ্যাত্ম প্রকৃতি ও তাহার অভিব্যক্তির মধ্যে সকল জিনিষেরই একটা অভ্যন্তরীণ

* "The desire of exclusive liberation is the last desire that the soul in its expanding knowledge has to abandon, the delusion that it is bound by birth is the last delusion that it has to destroy."—Sri Aurobindo.

নীতি ও অর্থ রহিয়াছে, কর্ম্মের প্রকৃত সত্য রহিয়াছে সেইখানে, মন ও তাহার ক্রিয়ার বাহ্য রূপের মধ্যে তাহা কেবল গৌণ ও অপূর্ণ-ভাবে প্রতিভাত হয়, অজ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। অতএব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ নিখুঁত উদারতম নীতি হইতেছে তোমার নিজের উচ্চতম ও অন্তরতম সত্তার সত্যটি আবিষ্কার করা এবং তাহার মধ্যে বাস করা, পরন্তু কোন বাহ্য আদর্শ বা ধর্ম্ম অনুসরণ করা নহে। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ সকল কর্ম্মই হইবে অপূর্ণ, দুরূহ, দ্বন্দ্বময় এবং সমস্যা-স্বরূপ। কেবল তোমার প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া এবং তাহার প্রকৃত ও যথার্থ সত্য অনুসারে জীবনযাপন করিয়াই সমস্যাটির চরম সমাধান হইতে পারে, দুরূহতা ও দ্বন্দ্ব দূর হইতে পারে, তোমার কার্য্যাবলী আত্মো-পলব্ধির নিশ্চিত আলোকে সংসিদ্ধ হইয়া যথার্থ দিব্য কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। অতএব তোমার আত্মাকে জান; তোমার আত্মাকে ভগবান বলিয়া এবং অন্য সকলের আত্মার সহিত এক বলিয়া জান; তোমার অন্তঃপুরুষকে ভগবানের একটি অংশ বলিয়া জান। তোমার সেই জ্ঞানে জীবন যাপন কর; আত্মায় বাস কর, তোমার পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে বাস কর, ভগবানের সহিত যুক্ত হও, ভগবৎ-সদৃশ হও। তোমার মধ্যে যে অদ্বিতীয় পরম পুরুষ রহিয়াছেন এবং জগতের মধ্যে যে অদ্বিতীয় পরম পুরুষ রহিয়াছেন, তোমার সকল কর্ম্ম প্রথমে তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ কর; শেষে তোমার সকল কর্ম্ম, তোমার সব কিছু তাঁহার হস্তে তুলিয়া দাও, পরম বিশ্ব-পুরুষ তোমার ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার নিজ ইচ্ছা ও কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। আমি তোমাকে এই সমাধানই দিতেছি, আর শেষ পর্য্যন্ত তুমি দেখিতে পাইবে যে, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন সমাধানই নাই।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিরাট সংস্করণ)
শ্রীমদ্ভগবদগীতা (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ
শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ
The Message of the Gita
The Gita
Songs from the Soul
Sri Aurobindo and the New Age
The World Crisis—Sri Aurobindo's Vision of the Future
Mother India.